প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা
২. পূর্ব-সূরী - বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র
৩. পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ।

6. मित्र

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

নর-নারী মাত্রেই বিচিত্র বাসনা-কামনা বলয়িত। এই বাসনা কামনাই ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে সাধারণভাবে 'ষড় রিপু' বলা হয়। মানব জীবনের বা জীবন-রহস্যের ইহা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধ্যাত্মিক অনুশাসনে ও ভারতীয় জীবনে 'ষড় রিপু' সাম্যে রাখিবার কিছু বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে। সভ্যতা ও যান্ত্রিক-বিন্যাস যতই মানব-সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নততর করিয়া তুলিতেছে ততই জীবন-যাত্রায় মানবিক শাশ্বত সম্পর্কগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। মানব সভ্যতার অপরিহার্য সৃষ্টি হইতেছে নগর শিল্প, বৃত্তির পরিবর্তন ও প্রথাসিদ্ধ চিন্তা-রুচি ধ্যান-ধারণার বিবর্তন। মানবিক মূল্য বোধের তারতম্যই সম্ভবত পরিবর্তিত স্থান বৈগুণ্যে মানুষের শাশ্বত মানবিক বোধ ও বৃত্তিগুলিকে বিপর্যস্ত ও জটিল-রহস্যে দিশাহারা করিয়া এক অনিশ্চিত পথের সূচনা করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে — ইহাতে গতির লক্ষণ যেমন বর্তমান তেমনি আছে স্থির বিশ্বাসের অবক্ষয়। আধুনিক যুগে ফ্রয়েড - এলিস মানব মনের অবচেতন লোকের গুহাহিত রহস্য-জটিলতা উদ্‌ঘাটন করিয়া ইহার শক্তির কথা ও সক্রিয়তার অমোঘতা সম্বন্ধে এক অভাবনীয় সম্ভাবনার বিষয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিয়াছে। মানব সমাজে অর্থনৈতিক-বিন্যাস ও অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধে উন্মুখ মানব-সমাজ এক গভীরতর, সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সংকট মোচনের জন্য বিশ্ব ব্যাপী মানব-মনীষা জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়াসী হইয়াছেন। তাই কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কার করা সাহিত্যিকদের পক্ষে হয়ত এখনই সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক - বিন্যাস সম্ভবত, সমাজদেহ আশ্রিত বা সমাজ-নির্ভর বা সমাজ-নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষের ব্যবহারগত আচরণের নিয়ামক- সেখানে শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে বা মৃত প্রায়ও হইতে পারে। ইহা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিভংগী দিয়া লেখক এই পরিবর্তন শীলতাকে দেখিয়াছেন — জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী অথবা খণ্ডতা দর্শনে জীবনের মূল তাৎপর্যকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আলোচ্য পর্বে কল্লোল-সমকালী লেখক কুল এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগ-সন্ধিক্ষণে গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারের ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। কেহই অভিজাত - ধনী কুলোদ্ভব নয়। মনের দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়া

মধ্যবিত্তের রস-রুচির ধারক ও বাহক এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কূলপ্লাবী প্রভাব কবলিত । রুশ বিপ্লব -'কলোনিয়াল' শাসন-শোষণ , প্রথাসিদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার ভাঙনের মধ্যে জীবন-রস ও জীবন-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে । এই সময় নূতন কোন প্রত্যয় সিদ্ধ জীবন-বোধ পাকাপাকি ভাবে পরিবর্তিত সময়-সীমায় তাহাদের অন্তর লোকে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই । প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সুনিশ্চিত সংকট বাঙালীর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে রাতারাতি সজোরে আঘাত করে নাই — যাহা হইয়াছে তাহা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (slum) এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ভারতে তথা বৃটিশ শাসিত বাঙালাদেশে অতি সামান্যই অনুভূত হইয়াছে । বৃহত্তর গণ-জীবনকে স্পর্শ মাত্র করে নাই । তবে কেন কল্লোল সমকালীন লেখককুল জীবনের প্রতি Sceptical ও তীর্যক দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন হইলেন ইহার কারণ হয়ত আরও গভীরতর বলিয়া মনে হয় ।

কল্লোল-সমকালীন লেখক-কুলের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম কারণ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া নূতন কোন সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টি করিবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার এক অভিনব Experiment রুশ, নরওয়ে , স্ক্যানডেনীয় , ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের কতিপয় গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের রচনার ভাব-ধারা ও জীবন-রহস্যের আদিমতা, নারীর অমাতৃসুলভ রূপ, দারিদ্র্য - হতাশা অর্থনৈতিক - বিন্যাসে , সমাজ-পটে নর-নারীর আচরণ ও যৌনাবেগ প্রভৃতির উগ্রতা নূতনত্বের মোহে বাংলা গল্পে ও সাহিত্যে দেশীয় ভাঙনধর্মী জীবন-যাত্রায়, অবক্ষয়িত সমাজও অর্থনৈতিক - বিন্যাসে কাহিনীর উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাষায় চেতনা প্রবাহ, মনোস্তত্ত্বমূলক জটিলতার জালে, নর-নারীর আদিম প্রবৃত্তির অহেতুক আতিশয্যে, দারিদ্র্য ও শোষণের ছিন্নমস্তারূপে জীবনকে খণ্ডিতাংশে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা জীবনের সব নয় । জীবনের অংশ বিশেষ মাত্র । সম্পূর্ণ 'মানুষ' যেখানে অনুপস্থিত তবুও এই গল্প-উপন্যাস বৈচিত্র্যে ও স্বাদে অনন্য ।

আর এই সময়ের লেখককুল আধ্যাত্মিকতায় তেমন বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । অধিকন্তু মার্কস-এঙ্গেলসীয়-বস্তুবাদের প্রতি অনেকেই অনেকস্থানে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । কারণ তাঁহারা মনে করিতেন মানব জীবনের সব বিকৃতির মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক বন্ধনের

উপর

অনিশ্চয়তা। সুস্থ মানব সমাজ অর্থনৈতিক বণ্টনের উপর একান্তই নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কিন দেশে প্রাচুর্যের মধ্যেও মানবাত্মার দুঃসহ যন্ত্রণা, ক্রন্দন ও হাহাকার ধ্বনি একালের মার্কিণী জীবনেও সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছে।" An Affluent Society " নামক গ্রন্থ ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত মার্কিণী - ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যের প্রতি মানবাত্মার (মার্কিন দেশের) বিতৃষ্ণাজাত অস্থিরতা বস্তুবাদ হইতে আধ্যাত্মিকবাদে দেহ-মনের পূর্ণ মুক্তির জন্য দলে দলে হিপি - হিপিনী ও জীবনার্থ সন্ধানী মানুষের ধারা ভারতে অব্যাহত রহিয়াছে — তাই অর্থ জীবনের সব নয়। তাই মনে হয় বস্তুবাদে বিশ্বাসের ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে স্থির বিশ্বাসের অভাব হেতু ইহাদের মানস-গঠন ও মনোভঙ্গী ঐরূপ গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছে। তবে কিছু যে ব্যতিক্রম আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে ব্যতিক্রমগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কল্লোল সমকালীন কয়েকজন লেখকের রচনার পৃথক পর্যালোচনায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। মানুষ পশু নয়, তার মানুষ সব সময় আদিম - প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্মপ্রেরণা লাভ করে না —'সবার উপরে মানুষই সত্য' — এই সত্যই কল্লোল সমকালীন লেখককুলের কয়েকজনের মধ্যে — গল্পে উপন্যাসে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতায় লক্ষ্য করা সম্ভব নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবুও উল্লেখ করা প্রয়োজন কল্লোল-সমকালীন লেখককুল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া নূতন কোন পথ-নির্দেশ করিতে পারেন নাই অন্তত বাস্তবতার ক্ষেত্রে। এই অধ্যায়ের উপসংহারে হরপ্রসাদ মিত্রের আধুনিক সাহিত্যে স্বরূপ ব্যাখ্যার একটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন —"রবীন্দ্রযুগের মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতি থেকে এখনও যে সম্পূর্ণ উবে যায় নি, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং তৎপরে আমরা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছি এবং হচ্ছি বটে, সামাজিক সম্পর্কের অভ্যস্ত মাধুর্যেও যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই, — বেকার সমস্যা এবং উদ্বাস্তু সমস্যাও নগণ্য নয়, — তথাপি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্র-যুগের পরবর্তী অন্যকোন নেতৃনামবেদ্য অধ্যায় এখনো শুরু হয় নি। বর্তমান যা চলেছে, — তা রবীন্দ্রযুগেরই অন্ত্য-পর্ব — অথবা বড়োজোর বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-তিরোভাব -জনিত অবক্ষয় (decadence) পর্ব। এই পর্বে আমাদের অভ্যস্ত রাষ্ট্রিক - সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কিছু কিছু কন্দন হয়েছে বটে, তবু সাহিত্যের আসরে যুগন্ধর নবীন স্রষ্টা কোথায়? নূতন সংস্কৃতি এখনও স্তন্যপায়ী। চিন্তাশীল শুভার্থিরা তার পুষ্টি কামনা করবেন, — যুগ তোষক অগ্রগামীরা তাকে দোলনায় দোলা দেবেন, — কিন্তু যতদিন সে-সংস্কৃতি সাবালক না হয় ততদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বাস্তবতার' নামে সাংবাদিকতা, ব্যক্তির নামে বিভ্রান্তি, এবং নূতনত্বের নামে উৎপাত যে কিছু পরিমাণে ঘটবেই তাতে আর সন্দেহ কি? তবে ভরসা এই যে শুভবাদিত্বের প্রসাদে

বাংলা সাহিত্যের হাওয়া দীর্ঘকালের মত সুরভিত হয়ে গেছে এবং সেই আবহয়ের গুণে সাধারণ বাঙালী লেখকের গদ্য-পদ্যের হাত যে পেকেছে তাতে সন্দেহ নেই । অতএব এই সুনৃশক্ষ মধ্যবর্তীদের শব্দচালনা যে চলনসই না হবে এমন আশংকা নেই — এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিমান সুকালচেতন যুগ স্রষ্টা লেখকের সুস্থতর বাস্তব দৃষ্টির স্বাস্থ্যকর, শক্তিবর্ধক, স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাপ এবং দীপ্তির প্রতীক্ষা করতে করতে বাংলা গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিকে ও প্রকরণে আরো বিচিত্র পরীক্ষা আমরা দেখতে পাবো বলে আশা করতে পারি ।"[২]

'কল্লোল' সমকালীন গল্প-উপন্যাসে চরিত্র পরিকল্পনা অধিকাংশই 'সৃষ্টি কার্য' হয় নাই — প্রায়শই 'আবিষ্কারকার্য'। সৃষ্টির জন্য চাই প্রেম — আবিষ্কারের জন্য জ্ঞান । বিষয় - সচেতন ও বস্তু সচেতন জ্ঞান কল্লোল-সমকালীন লেখকবৃন্দের অনুপ্রেরণা দিয়াছে । শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত্র 'আবিষ্কারধর্মসঞ্জাত' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্র 'সৃষ্টিকার্য' ও 'আবিষ্কারকার্য' — তাহার হীরা, দেবেন্দ্র আবিষ্কার, সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী সৃষ্টি । রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের মহিম, কৈলাস, পরেশবাবু, কৃষ্ণদয়াল আবিষ্কার এবং গোরা, আনন্দময়ী সুচরিতা সৃষ্টি । আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তি সৃষ্টির জন্য চাই কল্পনাশক্তি ও প্রেম । এই কল্পনা শক্তির তৃতীয় নেত্র প্রেম । প্রেম-দৃষ্টিতে বিশ্বচৈতন্যে লেখকের উত্তোরণ হইলে 'সৃষ্টিকার্য' সম্ভব । রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'সৃষ্টিকার্য' আবিষ্কারকার্য দুইই সম্ভব হইয়াছে কারণ উচ্চেতন, চেতন, অবচেতন এই তিনলোকের রূপ-মূর্তি তিনি কল্পনা ও প্রেম-দৃষ্টিতে ব্যক্তিচৈতন্যের ঊর্ধ্বে বিশ্ব চৈতন্যে যুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম ছিলেন । তাই তিনি ত্রিলোক দর্শী । আর -ত্রিকালদর্শীও বলিব তাঁহাকে । কল্লোল-কুল লেখকবৃন্দ রবীন্দ্র - নাথের মত ত্রিকালদর্শীও ত্রিলোক-দর্শী নন । 'বাস্তব' বলিয়া যাহা সাহিত্যে আনিলেন অবচেতন লোকের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন তাহা নিতান্তই জীবনের খণ্ডিতাংশের একদিক মাত্র ।

১.

সাহিত্যে কাল-পর্ব ও যুগ নির্ধারণ করা জটিল ও দুরূহ । সাধারণ পার্থক্যগুলি দেখিয়া মোটামুটি স্থূলভাবে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে যুগ বা পর্ব নির্ধারণ করা হইয়া থাকে তাহা কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার ও সমীক্ষার ফল । এই সমীক্ষা অনেক সময় সূক্ষ্ম - অন্তরধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা পরিহার করিয়া বিশেষ কোনো যুক্তি বা পরিণতির নির্দেশ করিয়া থাকে । তাই সাহিত্যে এই পর্ব-বিভাগ, কাল-বিভাগ ও যুগ নির্ধারণ

অপরিবর্তনীয় সুতঃসিদ্ধ নয়। সাহিত্যে একটি যুগ-ধর্ম পরবর্তী যুগেও পূর্ব-যুগের ও প্রবণতার রেশ টানিয়া চলে আর যুগের এই Overlapping between the generations স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্ট সাহিত্যের আপন প্রাণ-শক্তির গতিতে অব্যাহত থাকে — " Literary generations move imperceptibly one into another. The last appears to be still flourishing when its successor is already confident of victory. - At any moment the men and women who read and write are of many ages and belong to different climates of thought and feeling."

প্রত্যেক কালপর্বেই বা যুগেই 'Overlapping ' ঘটিয়া থাকে। তাই সূক্ষ্ম বিচারে কোনো সাহিত্যের যুগকে পৃথক করা সম্ভব নয় স্থূল লক্ষণ ও প্রবণতাগুলির প্রাধান্য বিচার করিয়া পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বৈশিষ্ট্য ধর্ম নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুগেরই একটি নিজস্বতা থাকে যেমন বিশেষ রুচি (taste) ও আকার (form) আর ' Quality of mind' সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সব কিছুই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক। তথাপি বলা যায় যে সাহিত্যের প্রবাহের ধারাটি আন্তর সত্যের দিকদিয়া সতত গতিশীল ও অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের এই প্রবাহের ~~ধারা~~ মধ্যে যে 'আবর্ত' বা 'ঘূর্ণি' সৃষ্টি হয় তাহাই যেন মননগত, কাল-গত, পারিপার্শ্বিকগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শত কীর্ণ বৈশিষ্ট্য ধর্ম বিংশ শতকেও রেশ টানিয়া যায় কিছু সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কল্লোল' পত্রিকা(১৯২৩ খ্রীঃ) প্রকাশের পর হইতে পূর্ববর্তী যুগ-বৈশিষ্ট্য ও মানস-লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রাণ - শক্তিতে সক্রিয়তা হারাইয়া ফেলিতেছিল। দূর হইতে আমরা যদি এই পূর্ববর্তী প্রবণতাও লক্ষণ লক্ষ্য করি তবে সেগুলিকে কয়েকটি 'উপ-যুগ' বা কাল-পর্বে স্থূলভাবে ভাগ করা যায়। এই ভাগগুলি মোটামুটি লেখক-কেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। লেখকের মনোধর্ম, চিন্তা বিশ্বাস, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপরই উপন্যাস সাহিত্যের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। ঔপন্যাসিকের প্রত্যয় ও জীবনদর্শনই উপন্যাসের নায়ক - নায়িকার জীবন দর্শন ও প্রত্যয়-বোধ। কারণ ঔপন্যাসিক তো স্রষ্টা — তাঁহার সৃষ্টি কখনো' recreation ' আর কখনো বা ' imitation ' হইবে। একজন ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন —" A literary generation is what it is by virtue of the minds of persons and what they write. The trends will exists; they will be decribable - but no sooner have they been described than certain individuals will thrust themselves on us by their defiance of fashion, making nonsense of generalisation sometimes the exceptional writer will seem to be a <u>reviver of the past,</u> <u>sometime a fore runner of the future."</u>

আমার মনে হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ গান্ধী-প্রদর্শিত অসহযোগ আন্দোলনের লগ্নটি আমাদের বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে বিশেষ একটি 'চিত্ত - বিপ্লব' ও 'বন্ধন- মুক্তির' দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বস্তুত সাহিত্যেও এই যুগ ক্রান্তি - পর্বের অস্ফুট উন্মেষ ঘটিয়াছিল এই সময়টি ঘিরিয়া। অসহযোগ আন্দোলনের অল্পকাল পরেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকাপ্রকাশ। ইহার পূর্বে 'ভারতী' গোষ্ঠী ও বীরবলের 'সবুজ-পত্র' আপন আপন সুঘোষিত সুধর্ম (-সাহিত্যে নবত্ব) পালন ও সাহিত্যকে নূতনত্ব দানের তাগিদে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। 'ভারতী' ও 'সবুজ -পত্র' এর প্রেরণা-উৎস ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ইহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য ছিল 'নারায়ণ' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকা। যে আধুনিক যুগ প্রত্যাসন্ন তাহা বহন করিবার দায়িত্ব শুধুমাত্র 'ভারতী' গোষ্ঠী, 'সবুজ-পত্র' গোষ্ঠী গ্রহণ করে নাই - ইঁহারা শুরু করিয়াছিলেন, অনাগত কালের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন — তাঁহারা fore-runner of the future. রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের প্রধান মধ্যমণি। প্রধানতম প্রেরণা-উৎস, পথ-নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে নব-পর্যায়ের পথপত্তির কথা ব্যতীত ও 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে আধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব কয়টি লক্ষণ বর্তমান।

আমার গবেষণা নিবন্ধটি অনুমান সাপেক্ষ কোনো কল্পিত কাল-সীমায় আবদ্ধ না করিয়া মোটামুটি ভাবে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর্ব (১৯২০ - ২১) ধরিয়া আবেগ-প্রবণ বাঙালীর চিত্ত-বিপ্লবের গূঢ় - সঞ্চারী ভাব-জটটির উল্লেখ করিয়া লেখক কেন্দ্রিক আলোচনা -পর্যালোচনা যুগ-প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মূল্যায়ণ করিয়া একালের উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আমার আলোচনার এক কোটিতে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ - ২১) অপর কোটিতে মোটামুটি বাংলা দেশের 'মুক্তি-যুদ্ধ' (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। উভয় ঘটনাই বাঙালীর চেতনার মর্মমূলে গিয়া সজোরে আঘাত হানিয়াছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ইহার impact দুর্লক্ষ্য নয় যেমন অন্নদাশংকরের উপন্যাসগুলিতে আছে গান্ধীর প্রভাব। মানুষের চারিদিকে যেমন একটি বাহিরের জগৎ আছে ঠিক তেমনি বিপুল একটি জগৎ বর্তমান ভিতরেও। বাহিরের জগতের কথাই 'গল্প' বা 'কাহিনী' আর ভিতরের জগতের কথা 'মনন'। অন্তর্লোকের বার্তাবাহী একালের উপন্যাসতাই মননাশ্রয়ী। ইহাও আধুনিকতার আর এক সম্ভাবিত অভিব্যক্তি। লেখকও অন্তর্মুখী। সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রও অন্তর্মুখী। মানুষে মানুষে ব্যবধান সমাজ এর খণ্ডীকরণ, ফলে বিচ্ছিন্নতা(isolation)

একাকিত্ব ও তদনুযায়ী বিষাদের শিকার ব্যক্তি — লেখক ও ইহার প্রভাবাধীন সৃষ্ট চরিত্রগুলিও উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ফলে সামাজিক জীবনে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাহার মূল ব্যাখ্যা সব সময় পাওয়া যায় না। আমাদের যাত্রা সুরু ১৯২০ – ২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আর সমাপ্তি (সাম্প্রতিক) ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত নিম্নলিখিত ঔপন্যাসিক ও তাঁহাদের কতিপয় সুনির্বাচিত উপন্যাস।

১। বুদ্ধিসাধ্য বাস্তব নিষ্ঠ জীবন সমস্যার প্রাধান্য :—

(ক) ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৬১)

(খ) দিলীপ কুমার রায় (১৮৯৭ – ১৯৮০)

(গ) শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪ খ্রী: — জীবিত)

২। পরিবেশ সৃষ্টি ও রোমান্টিক ভাবুকতা - দুর্লভ গোচর জীবন।

(ঘ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০ খ্রী: – ১৯৭৫ খ্রী:)

(ঙ) শ্রী প্রেমেন্দ্র কুমার মিত্র (১৯০৫ খ্রী: – জীবিত)

(চ) শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭ খ্রী: – জীবিত)

৩। কাব্যের সুরাবেগের স্পর্শ ও অদ্যতনিক জীবন-বীক্ষা :—

(ছ) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩খ্রী: – ১৯৭৬ খ্রী)

(জ) বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮ খ্রী – ১৯৭৪ খ্রী)

৪। অবচেতন মন ও যৌন চেতনা : –

(ঝ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ খ্রী – ১৯৫৬খ্রী:)

৫। (ঞ) সমকালীন অপ্রবীন কতিপয় তরুণ উপন্যাসিক।

আলোচ্য পর্বের উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় বাহিরের জগৎ হইতে অন্তর্লোকে, ঘটনা প্রধান উপন্যাস হইতে ভাব প্রধান উপন্যাসে জীবন সম্পর্কিত কৌতূহল হইতে জীবন জিজ্ঞাসায় বাংলা উপন্যাসের উত্তরণের গতি অনিবার্যভাবে ত্বরান্বিত হইতেছে। আর যৌন চেতনাও উপন্যাসের অপরিহার্য উপকরণরূপে সক্রিয়তালাভ করিতেছে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার জন্ম - লগ্ন হইতে ১৯৭২ বা ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত — এই কাল-পর্বের চেনা - কালের চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই সময়টি বিশেষগুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী অস্থির। চঞ্চল বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত দুনিয়া, ইহার সহিত পূর্বতন দুনিয়ার কোনো সুরের সঙ্গতি বা মিল নাই। —" আজ যে চাঞ্চল্য অসন্তোষ বিদ্রোহ মহাসাগরের কূলে কূলে তরঙ্গিত তাহা দুই গোলার্ধে দেশজাতি ও রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করেছে পুরনো মূল্যবোধ, প্রাচীন সংস্কার

ও গুরুবাদী মনোভাব বর্জনে ।"[৫] যুগ-যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠা যে মনোভাব ব্যক্তি ও সমাজের উপর যে শক্তিতে ক্রিয়াশীল ছিল তাহা আজ যেন নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে । ইহারই পরিবর্তে বুদ্ধি-নির্ভর স্বাধীন-দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিতেছে । এই গঠন- মুহূর্তে বিভিন্ন - ব্যক্তির চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে — ইহার ফলে অনিশ্চয়তা , চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ প্রবণতা জন্মলাভ করিতেছে । এই ভারতবর্ষ হইতেছে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ । একালের পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাটি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া একান্তই প্রয়োজন ——' একদিকে জাতির পুর্নজন্ম অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কারের পুনরুজ্জীবন । এই দোটানায় ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক জীবন বিভ্রান্ত । পূর্বের পরিচিত সমাজ আজ বিলুপ্ত অথবা বিলীয়মান । কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ আজ প্রায় অসম্ভব । পূর্বের সমাজে গুরুবাদ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যাত্রার নিশ্চয়তাও ছিল । আজ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং বহুক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন । পুরোনো সমাজ বন্ধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই । আজকের দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা তাতে আজ কোন দেশ অথবা সমাজের পক্ষে বাইরের পৃথিবীকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার পথ নেই । যে সব মানুষের সঙ্গে জীবনে কোনো দিন দেখা হবে না, তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা সাধারণত ভাবি না, তারাও আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে । আমাদের অজান্তে যে সব সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবনমরণও তাদের উপর নির্ভরশীল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যক্তিবোধ-এর পূর্বে কোনদিন এত নিরুপায় বোধ করেনি । একদিকে বিপুল বিশ্বেরভার এবং অন্যদিকে ব ব্যক্তি বিশেষের অসহায়তা: তারই মধ্যে আজকার তরুণ-সম্প্রদায় অনিশ্চিত বিদ্রোহে অজানা লক্ষ্যের দিকে চলেছে । চির দিনের শান্ত আত্মস্থ ভারতবর্ষ তাই আজ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে । ভারতবাসী আজ পরিচিত বন্দর ছেড়ে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চায় । লক্ষ্য আজো স্পষ্ট নয় । কিন্তু লক্ষ্যের জন্য আকুতি আজ অনস্বীকার্য ।"

" কোন সমাজ বা কোন যুগই কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয় । হতে পারে না । দুনিয়ায় একেবারে নতুন কিছুই নেই । সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যে সমস্ত অভিব্যক্তিকে একান্তভাবে নোতুন মনে হয় , বিচার করলে দেখা যাবে যে তাদেরও ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে । তা সত্ত্বেও পুরাতনের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য যে এক অর্থে নোতুন , একথাও অস্বীকার করা যায় না । শুধু ভারতবর্ষ বলে নয় , সমস্ত পৃথিবীতেই গত দুই তিন দশকে পরিবর্তনের গতি ও পরিমাণ অভূতপূর্ব । ইতিহাসের আদিম কাল থেকে প্রায় দশহাজার বছরেও যে সব বদল সম্ভব হয় নি গত দুই -তিন শো বছরে সেগুলি বাস্তবরূপ নিয়েছে । মানুষের সমাজে

যে সব পরিবর্তন গত দুই তিন শো বছরে হয়েছে তার তুলনায় পূর্বের দশ হাজার বছরের ইতিহাসকে গতিহীন স্থাবর সমাজের ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। গত পঞ্চাশ বছরে এই পরিবর্তনের গতি আরও বেগবান হয়েছে। বর্তমানে দশ বছরে যে সব পরিবর্তন আসে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয় নি।

বর্তমান যুগের দুটি বৈশিষ্ট বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে পরিবর্তনের গতিবেগ অপ্রত্যাশিত ভাবে বেড়েছে এবং আজও বাড়ছে। অন্যদিকে আজ এ পরিবর্তন কোন বিশেষ দেশ - কালে সীমিত হয়। আজ প্রত্যেক পরিবর্তনের ফল পৃথিবী ব্যাপী।"[৬]

বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার ও সাম্প্রতিক কালের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি মূলধারা সন্ধান করিলে মোটামুটিভাবে উপন্যাসের অদ্যাতনিক কালবৈশুণ্যের একটি চেহারার আদল পাওয়া যাইবে — উপন্যাসের প্রকৃতিও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কাহিনী প্রধান উপন্যাস দেখা দিল ওই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশশতকের প্রথমার্ধে চরিত্র-প্রধান ~~ও~~ উপন্যাস আর বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখক - প্রধান উপন্যাসের ধারার উদ্ভব হইল। আমার গবেষণা - নিবন্ধটির আলোচনার ধারাটি লেখক - কেন্দ্রিক করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। আধুনিক কালের উপন্যাস লেখকের আত্ম-প্রকাশের প্রবণতম বাহন হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকৃতি নির্ধারণ অনেকাংশে সমীক্ষা করিবার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল ও স্থূল ইহা স্থতঃ সিদ্ধ অপরিবর্তনীয় নয়। উপন্যাসের নানা মুখী প্রবণতা ও গতি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই আলোচনার সামগ্রী। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচ্য পর্বের উল্লিখিত ঔপন্যাসিকবৃন্দের পূর্ব-সূরী যদি কেহ থাকে তাহারই সংক্ষিপ্ত রেখা-চিত্র দিতে সচেষ্ট হইয়াছি এই অংশে। যুদ্ধের পরে মানুষের মনে মূল্যবোধের অনেক রূপান্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ইহাই যেন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মানুষের মনে যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা-বিপর্যয় ইহার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব মানুষের চিন্তায় ভাবনায় মানসিকতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে প্রয়াসী এই কারণেই কাল ও ঘটনা বৈগুণ্যে ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাস হতাশা সংশয় ও বিদ্রোহের বার্তাবাহী হইয়া উঠে। ইহারই ফলে সাহিত্য প্রচেষ্টার মধ্যে যুগ-ক্রান্তির ও নূতন মূল্যবোধের সূচনা-লক্ষণ স্ফুটতর হইয়া উঠে। ইংরাজী ১৯২০ - ২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের পর্যালোচনা নির্বাচিত লেখক-কেন্দ্রিক ও সুনির্বাচিত উপন্যাস নির্ভর করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে এ যুগের উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি বিচিত্র মুখী ও ইহার প্রবণতাও নানাচারী – লেখকের ব্যক্তি মানসের প্রকাশ মাধ্যম

যে ব্যক্তি মানস যুগ ধর্মে কাল ও ঘটনা বৈগুণ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বকীয়তায় স্ব-নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে ।

আলোচ্য কাল-পর্বে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী ও গূঢ় সঞ্চারী পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির আলোচনায় নিম্ন-উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি স্মরণীয় । — যে সময় "স্কুল কলেজের শিক্ষা দিন দিন প্রসারিত হইতেছে অর্থাৎ পাশ করা ছেলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা বাড়তির মুখে সেই সঙ্গে বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যাও ক্রম বর্ধমান, তবুও শিক্ষা প্রাপ্তের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে সাহিত্য-পাঠকের বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা ও মনের উজ্জ্বলতা ঘটিতেছে না । ইহার একটা বড় কারণ বাঙালীর ঘরের ব্যবস্থার ও আবহাওয়ার পরিবর্তন । ভদ্র বাঙ্গালী অধিকাংশ এখনো ছিলেন পল্লীবাসী এবং অনেকেই আপন ভূমির উৎপাদনভোগী । চাকরীর খাতিরে শিক্ষা - প্রাপ্তদের শহর - নিবাসী হইতে হইতেছে বটে, কিন্তু শতাব্দের গোড়ার দশক পর্যন্ত তাহাদের মনের টান ছিল ভিটার পানে । বছরে একবার অন্তত পূজার ছুটিতে দেশে গিয়া মানসিক শান্তি বিনোদন করিয়া আসিবার সুযোগ ছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শরতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, পল্লী-সমাজের নিরুদ্যম অকর্মণ্যতা এবং জমির ভাগাভাগির ফলে দেশে যাওয়ার আবশ্যকতা দিনে দিনে কমিয়া আসিতে লাগিল । সুতরাং যাহার কিছু মাত্র উপায় ছিল সে শহরে-মুখ্যত কলিকাতায় বারোমাসের বাসিন্দা হইল । উত্তর ও পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়ার অত্যাচার ছিল না বটে তবে সেখানেও ভদ্র বাঙ্গালীর অর্থ সংকট দেখা দিতে এবং কলিকাতার মহিমা দিন দিন উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল । এই সব কারণে পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালী যতদূর সম্ভব কাজে ন পার্যমানে চিন্তায় (কলিকাতা) নগর বাসী হইয়া পড়িতে লাগিল । কলকারখানা প্রসারের ফলে অশিক্ষিত সুযোগজীবী বাঙ্গালীও পারিলে শহরোপকণ্ঠবাসী হইতে লাগিল । এ পরিবর্তন কালগত এবং অবশ্যম্ভাবী ।"

"পল্লীজীবনে ছেদ পড়ার আগেই একান্নবর্তিতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল । ভদ্র বাঙ্গালীর সংস্কার-স্থিতি একান্নবর্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । একান্নবর্তিতায় ফাটল ধরিল । অথচ সমস্ত সামাজিক কাজই আগেকার মতো যথাসম্ভব বিরাট আয়োজনে ফাঁদা হইতে লাগিল, যতদিন পারা যায় । এই কারণে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার অবনতি দ্রুততর ঘটিতে লাগিল । বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া দুরূহ হইতে লাগিল । অগত্যা মেয়েদেরও

স্কুলে পাঠাইতে হইল । ইস্কুল - কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে আর আগেকার একান্নবর্তি চালে আত্মীয় পরিজন লইয়া চলা সম্ভব হইল না । সুতরাং ঘরের আয়তন ও আবহাওয়াও বদলাইতে লাগিল ।"

"ঊনবিংশ শতাব্দে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবাধ ক্ষেত্র ছিল হাইকোর্ট অথবা জেলা কোর্টে ওকালতি । এখন দিনদিন বি-এল্ পাশ করা গ্র্যাজুয়েটের ভিড়ে সে ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইতে লাগিল । চাকরির ক্ষেত্র তো আরও সংকীর্ণ । ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশের বাহিরে গিয়া জীবিকা অর্জন করিবার দিকে খানিকটা ঝোঁক দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের সে চেষ্টার ফলে অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । এখন স্বদেশিও স্বাধীনতা আন্দোলনের পান্ডা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালাদেশের বাহিরে খাতির জমাইতে দিতে বিদেশি শাসকের বিশেষ অনিচ্ছা । এমন কি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে খাস বাঙ্গলারও খানিকটা টুকরা বাহির করিয়া লইয়া বাঙ্গালাদেশকেই ছোট করিয়া ফেলা হইল । বাঙ্গালীর ঘরের হাতায় যেন প্রাচীর উঠিল । বিহার উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে সরকারী চাকরির ক্ষেত্র আরো সংকুচিত হইল । অথচ এখনো উচ্চশিক্ষা এমন খাতস্থ হয় নাই যে আপিসে চাকরি ও কোর্টে ওকালতি ছাড়া আর কোন জীবিকায় তাহার মন বসিতে পারে । .... মিন্টো-মর্লি রিফর্ম-এর (১৯১০) দৌলতে শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতম চাকরিতে নিতান্ত দুই চার জন যোগ্য উচ্চশিক্ষিতেরই স্থান হইতে লাগিল । ওকালতি ও শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ না থাকায় এই দুই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখাদিল । বাঙ্গালীর জেদ যখন জয়ী হইল, বঙ্গভঙ্গ রদ হইল । শাসন কর্তৃপক্ষ ভাবিয়া ছিলেন ইহাতে বাঙ্গালী শান্ত হইবে । তাহা হইল না, পূর্ব - পশ্চিম বঙ্গের পুনর্মিলন বিপ্লব প্রচেষ্টায় অবসান ঘটাইতে পারিল না । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে প্রচেষ্টার বাহিরে চাপা আগুন নিভিল না । ধূম ছাড়িতে লাগিল । মন্টেগু - চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) সান্ত্বনা কার্য্যকর হইল না । গান্ধীজী নন্-কোঅপারেশনের শঙ্খধ্বনি করিলেন, দেশের সর্বত্র হইতে সাড়া জাগিল । প্রমাণ হইয়া গেল যে স্বাধীনতার আকাংক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিমত নাই । নন-কোঅপারেশনের ফল ভালোমন্দ দুই রকমই ফলিল । ভালো ফল – জনশক্তির সংহত রূপের ক্ষণিক হইলেও অভ্রান্ত পরিচয় — পাওয়া গেল, আর মন্দ ফল হইল – ইস্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মনে অবিনয়ের , বিধি - উল্লঘনের মনোবীজ উপ্ত হইল আর দেশের অন্তস্তলে যে গঠন - ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত হইল ।"[৭]

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করিয়া উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি নি… পূর্ব-উল্লিখিত বিষয়গুলি অনিবার্য্য ভাবেই স্মরণ করিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যে ভারত… যে পথের ইঙ্গিত দিয়া ছিল সেই ইঙ্গিত ধারা নবীন সাহিত্যিকদের বাস্তব-প্রবণ করিয়াছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়া হইল তাঁহাদের দৃষ্টি গিয়া পড়িল সন্নিকট পারিপার্শ্বিকের দিকে — অর্থাৎ মোগলাই ভারতবর্ষ ও বংকিমী বাঙ্গালা এবং পার্থস্থ্য কলকাতা ছাড়িয়া সমাজের দরিদ্র কুৎসিত অবজ্ঞাত ও ছায়াচ্ছন্ন বসতির দিকে কিছু নজর দিলেন। এ দৃষ্টি মোলাটে তবুও আগেকার দরিদ্র নারায়ণী, সমাজ-সংস্কারী বা ভলাণ্টিয়ারী নজর নয়। ইহার মধ্যে ছিল কিছু সমবেদনা, কিছু জিজ্ঞাসা খানিকটা রোমাণ্টিক কল্পনা বিলাস, এবং সর্বোপরি "হঠাৎ ডেমোক্র্যাসির প্রেরণা। কণ্টিনেণ্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমাণ্টিক কল্পনা বিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণলেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন "বস্তি"-বিলাস ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইল। এ বিলাস-মোহ অবশ্য বেশিদিন টিকিল না। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও শক্তি স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক কমিয়া গেল।" [৮]

ভারতী আসরে এই বাস্তব দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন হয়। আর 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বাস্তবতা লালিত হয়। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২ - ১৯৬৪) যৌন আবেগ মূলক সাহিত্যের গুরু। ইনি ঢাকায় অধ্যাপনা - সূত্রে বাস করিয়াছিলেন সেখানে আইন - অধ্যাপনা সূত্রে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল নবীন-দৃষ্টিভঙ্গি-প্রবণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী। এই নবীন ও তরুণ সাহিত্যিক মণ্ডলী গল্পে - উপন্যাসে কবিতায় 'বাস্তব' অথবা আধুনিক ভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভারতীর আসর পরে ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতী গোষ্ঠীর কয়েকজন লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় কল্লোল পত্রিকা (১৯২৩) বাহির করিলেন। এই পত্রিকায় লেখক হিসাবে পরিচিত হন — অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র কুমার মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আর অন্নদাশংকর রায় ও ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সবুজপত্র -প্রমথ চৌধুরী প্রভাবিত) 'পরিচয়' (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৭ সাল) সুধীন্দ্র নাথ দত্ত সম্পাদিত) পত্রিকার সমকালেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অন্নদাশংকর আধুনিক ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কে মনন -এর দ্বারা ও হৃদয়ের সত্যে বুঝিতে অগ্রসর হইয়া উপন্যাস রচনা করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ও (ভারতবর্ষ পত্রিকা) অন্নদা শংকর ও ধূর্জটি প্রসাদের মত মনন ও হৃদয় ধর্মের দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপ প্রভাবিত আধুনিক কালকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উপরি-উক্ত কথা-সাহিত্যিকের পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র প্রভাব ও রবীন্দ্রানুসারিতাই মুখ্য । শরৎ চন্দ্রেরও অনুসরণ বুদ্ধদেবের রচনায় দুর্লক্ষ্য নয় । এমন কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেকি' গল্পেও ঘটনা বিন্যাস ও প্রেমলীলায় শরৎচন্দ্রীয় ভাববিলাস লক্ষ্য করা যায় । আমার মনে হয় চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯০৯), চতুরঙ্গ (১৯১৫), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), চার-অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪), দুই বোন (১৯৩৩) উপন্যাসে বস্তুত আধুনিক কালের মননদীপ্ত মুক্ত ও উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় । ছোটগল্পও ব্যতিক্রম নয় — 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) স্মরণীয় । বিংশ শতকের মননধর্মী কথা-সাহিত্যিকদের মুখ্যতম পূর্বসূরী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । কবিগুরুর 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) যখন প্রকাশিত হইল তখন অতি-আধুনিক রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী ও মোহিত লাল মজুমদারও (রবীন্দ্র বিদ্বেষী ?) বুঝিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব নয় । তাঁহারা নিজেদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, আর বুঝিলেন রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তির নাই । —"জানিলেন যে যে টেকনিক 'অতি-আধুনিকদের' কাম্য অথচ নাগালের বাহিরে তাহাতে যেমন অনায়াসে সাহিত্যে নূতন রূপের সৃষ্টি হইতে পারে । কথায় ও লেখায় যে কথা স্পষ্টভাবে বলা অসম্ভব ছিল সে কথাও রবীন্দ্রনাথ সহজে বুঝাইয়াছিলেন , — যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে দেউলিয়া বিজ্ঞাপিত (মোহিতলাল অন্যতম) করিয়া দিয়া নিজেদের নূতন কারবারী বানাইতে চাহেন তাঁহাদের মূলধন তো তাঁহারই কাছেই ধার করা । রবীন্দ্রনাথই নিবারণ চক্রবর্তী (শেষের কবিতা) যিনি পদে পদে নিজের শিল্পের গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া নিজে নূতনতর শিল্প সৃজন করিয়া চলিয়াছেন ।" [৯] শেষের কবিতার লাবণ্য-অমিতর প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইতেছে । বিষয়টি পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে —"মিতা কি ক'রে জানবে তুমি কী বলো, আর সেই বলার কী অর্থ'. আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হ'ল । ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ । কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী । নিবারণ এখনও নিজের কাছে নিজে পুরানো হয়ে যায় নি , — ও প্রত্যেক বারেই যে - কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা ।"[১০]

নর-নারীর সম্পর্ক লইয়া অতি-আধুনিক বাস্তিক-গুপ্ত যে সব কথা সাহিত্যিক প্রেমকেই "বিবাহের চেয়ে বড়" সম্বন্ধ লইয়া বড়াই করিতেছিল (রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসেও অন্নদাশংকরও এই বাস্তিক - গুপ্ত)" সেই সম্বন্ধের সাহিত্যে প্রতিফলিত রসরূপটি কি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটু পরিচয় 'ঘরে - বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে দিয়াছিলেন, আর একটু পরিচয় 'শেষের কবিতায় (১৯২৯) দিলেন ।"[১১] এবিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় ।

শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কে কবি একটি চিঠি লেখেন (প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সেই চিঠির অংশ উদ্ধৃত করিতেছি —"পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়, তার মূলেই হচ্ছে পরকীয়া আমার বাধ্য নয় বলেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এই জন্য বিবাহ যখন বর্বর যুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পরকীয়া সাধনার যুগে এসেছে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।"[১২]

এই অংশে যে তত্ত্বটি আছে তাহা পরকীয়া প্রেম — মনোনীত ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে প্রেম — এই 'থীম্' লইয়া উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হইয়া ছিলেন অন্নদাশংকর, দিলীপ কুমার, অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এই পরকীয়া প্রেমের সাহিত্যের রসরূপটি তাঁহারা দিতে পারেন নাই কেবল যৌন-চেতনার স্থূলত্বর চিত্তবিমোহন রূপটির উল্লেখ করিয়াছেন। অচিন্ত্য - বুদ্ধদেব তাহাকে কাব্যের সুরাবেগের স্পর্শে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন আর অন্নদাশংকর মননের দ্বারা সেই যৌন-চেতনার স্থূলত্বকে ('কন্যা', 'না', 'তৃষ্ণার জল', 'বিশল্য করণী', 'রত্ন ও শ্রীমতী') পরিহার না করিয়া জীবনের ও নর-নারীর সম্পর্কের মূল-তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন তবে প্রেমকে 'idealised' করিবার এক obsession তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে — প্রেমহীন বিবাহ বন্ধন-স্বরূপ, I যেমন শ্রীমতী (রত্ন ও শ্রীমতী)। আগে প্রেম পরে বিবাহ - একথাই হয়ত রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছে —"বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পরকীয়া সাধনার যুগে এসেছে বলেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।" রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্তই অগ্রসর হইয়াছেন আর আভাসে যাহা বলিয়াছেন ধাহা অনুক্তই আছে তাহা বিশদভাবে বলিতে গেলেই রসহানি ঘটে — যৌনতা জীবনে আছে ইহার অধিক্য হয়ত জীবনে সম্ভব কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও জীবনের সর্বশেষ কথা নয়। আলোচ্য পর্বের নির্বাচিত অতি - আধুনিক ঔপন্যাসিকবৃন্দ অবচেতন মন ও যৌনচেতনা আর অতিবাস্তবতায় দোহাই পাড়িয়া বোধ হয় বাস্তব হইতেই দূরে সরিয়া রোমান্টিক-কল্পনা বিলাসে অবগাহন করিয়াছেন — জীবনে যে বাস্তবের সম্ভাব্যরূপ তাহা সাহিত্যে রস-রূপ পাইবে কি করিয়া। অনেক ইহা হইতে বাদ যাইবে অনেক কিছু জুড়িয়া দিতে হইবে সেই 'অতি-বাস্তবই' idealised হইবে, তাহা recollected in tranquility হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন নতুবা বাস্তব বাস্তব হইবে না রোমান্টিক ভাবুকতায় পর্যবসিত হইবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদম ফুল' (মার্চ ১৯৬১) ও বুদ্ধদেব বসুর 'আয়নার মধ্যে একা' (১৯৬৭ - ৬৮) উপন্যাস দ্বয়ে বিবাহ-পূর্ব প্রেম ও দেশ-কাল পাত্র বৈগুণ্যের নর-নারীর জীবনের জটিলতার কথা ও ইহার পরিণতি দেখান হইয়াছে। 'প্রথম কদম ফুল'-এ বিবাহ-পূর্ব প্রেম - বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আর 'আয়নার মধ্যে একা'তে বাংলা দেশ বিভাগ উদ্বাস্তু জীবন — ছিন্নমূল যুবতী বিধবার দেশান্তর যাত্রা — জীবনের তীব্র সংগ্রাম বাঁচিবার জন্য উদগ্র — জীবন-তৃষ্ণা — আশ্রয় লাভ — আকস্মিকভাবে প্রেম পরে বিবাহ। চেতনা - প্রবাহ-পদ্ধতির অনুসরণ 'আয়নার মধ্যে একা' (১৯৬৭ - ৬৮) উপন্যাসে লক্ষণীয়। এই উপন্যাসটির শিল্পমূল্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা কমলার (নায়িকা) মনের পর্দায় অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ কীভাবে কোন আবেদন লইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বাঙ্ময় রূপেই সীমাবদ্ধ। মনে হয় বুদ্ধদেব বসুর আয়নার মধ্যে একা (১৯৬৭ - ৬৮) চেতনা-প্রবাহ ধর্মী উপন্যাসটি Charles Langbridge Morgan লিখিত "Portrait in a Mirror" (১৯২৯), অনুসরণে রচিত। পার্থক্য কেবল স্থানগত কালগত পাত্র - পাত্রীগত।

৬.

আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণা নিবন্ধটিতে যে কয়জন ঔপন্যাসিক আলোচিত হইয়াছে প্রত্যেকেই নিম্ন-লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ও প্রবণতা - ধর্মী বলিয়া মনে হয়। এক ॥ — তাঁহারা প্রত্যেকেই কম-বেশী প্রচলিত আদর্শে আস্থাহীন ও ব্যঙ্গপরায়ণ। আদর্শবাদের তীব্র বিরোধী বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও অন্নদাশংকরের রচনায় (গল্পে - উপন্যাসে) বিদ্রূপ পরায়ণতার নিদর্শন প্রচুর — এবং ইহাদের ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপবাণের লক্ষ্যস্থল হইতেছে — কবি যশপ্রার্থী তরুণ-তরুণী ('না' — অন্নদাশংকর রায়) মেদ বহুল ধনী, স্থূলরুচি ব্যবসায়ী, আত্মতৃপ্ত সরকারী কর্মচারী, কৃত্রিম-আচারে অভ্যস্ত অভিজাত সমাজ। কোনো বিশিষ্ট জাতি বা শ্রেণী নয় ইহাদের ব্যঙ্গের লক্ষ্য সমগ্র সমাজও পুরাতন আদর্শ।

দুই ॥ — আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অভাব ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় — তন্মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে সর্বাধিক — প্রায় সংকটাপন্ন অবস্থা।

তিন ॥ — যৌন জীবনের সংকট চিত্র।

চার ॥ — বাস্তবতাবোধের পুষ্টি সাধন।

পাঁচ ॥ — পাশ্চাত্য প্রভাব- স্বীকরণ (absorption)

85174

5 JAN 1984

ছয় ॥ — বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও যুক্তিবাদ প্রচার ।

সাত ॥ — সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূচনা ।

আট ॥ — বিভিন্ন মতবাদের অনুশীলন ও রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ।

নয় ॥ — অতি আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিম্নশ্রেণীর জীবনালেখ্য ।

দশ ॥ — নগর ও গ্রামের প্রভাব ।

এগার ॥ — বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি ।

বার ॥ — রূপ ও রীতি বিষয়ে পরীক্ষা - প্রবণতা ।

পূর্বসূরী - বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র

পূর্ব-সূরী

বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনা- শরৎচন্দ্র

আলোচ্য পর্বে যে কতিপয় ঔপন্যাসিক ও তাঁহাদের রচিত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কারণগুলোর পটভূমিতে পর্যালোচিত হইবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব ঐতিহ্য-প্রবাহটি ক্রিয়াশীল অথবা নিষ্ক্রিয় আমরা এই নিবন্ধে বিচার করিয়া দেখিব। এই বিচার বিশ্লেষণটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে সামাজিক জীবনবোধের তৎপর্য সন্ধানী হইবে। আর এই জীবনবোধের সহিত স্থান-কাল-সমগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও বিদ্যমান। তবে প্রত্যেকটি পরিবর্তিত মূল্যবোধই কারণগুলোজাত। আর উপন্যাসের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে এই কারণগুলো অধিকতর শক্তিশালী মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। কালের অমোঘ প্রভাব কোন ঔপন্যাসিক উপেক্ষা করিতে পারেন না। আলোচ্য পর্বের বিশ-তিরিশ দশক অথবা পরবর্তী সময়েও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র জীবিত থাকা পর্যন্ত সে সময়ের তরুণ বিদ্রোহী লেখকবৃন্দের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যধারা বা ঐতিহ্য হইতেছে (১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪), (২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) ও (৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮)। এই ত্রয়ী লেখক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটি নৈতিক (Ethical) ও সাহিত্যিক রুচি ও মেজাজ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন — তিনজনেই সংযমী সচেতন শিল্পী সামাজিক জীবনার্থ সন্ধানী। পূর্ণ জীবন বৃত্ত নর-নারীর সামাজিক অথবা সমাজ বিযুক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় উপন্যাসের নর-নারীকে দেখিতে ও দেখাইতে চাহিয়াছেন। তাহারা এই ত্রয়ী ঔপন্যাসিক জীবনের গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও প্রয়াসী হইয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী বা রবীন্দ্র সমকালীন লেখকগণ কীভাবে গ্রহণ - বর্জন করিয়াছেন নবীন বা অতি-আধুনিক পর্বে জীবন-বোধের রূপকার অথবা পূর্ববর্তী সাহিত্যিক ধারার সার্থক উত্তর সূরী হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন কি? এই অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর সিদ্ধান্ত স্থূল ভাবে করা হইবে তবে তাহা সুনিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় নয়।

প্রেম প্রণয়ের মধ্যে ব্যক্তির (নর-নারীর) স্বাতন্ত্র্য, স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠে। প্রেমই মানুষের গভীরতম ও নিবিড়তম প্রকাশ — এই প্রেম-চেতনার মধ্যেই তাহার স্বাতন্ত্রিকতা নিহিত থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেমের মধ্যেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সে প্রেমের-মধ্যে সমাজ-নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় অনুপস্থিত। ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধনীতিবাদী। তিনি যতখানি রোমান্টিক ততোধিক

দৃশ্যতঃ ক্লাসিসিস্ট (Classicist) — বিশুদ্ধনীতিবাদী হওয়ায় ইহাও অন্যতম কারণ। রোমান্টিক শিল্পীর কাছে নীতির স্থান ঊর্ধ্বে নহে। লিখিবার ধর্ম (Form) সম্পর্কে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) অতিমাত্রায় সচেতন ও সফলতম শিল্পী - গ্রীক গঠন রীতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি একজন বিশুদ্ধ আদর্শবাদী ঔপন্যাসিক, রোমান্টিকের মত স্বপ্ন দ্রষ্টা হইলেও সে স্বপ্ন কেবল কল্যাণ-প্রদ জীবন মুখে ফিরিয়া, ইহা ব্যতীত তাঁহার সাহিত্য পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যমূলক। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনায় কল্পনার উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন তাহা প্রধানত জীবনের শাশ্বতরূপ দেখাইবার জন্যই। এই কারণেই সমাজের পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট স্থির- নৈতিক মানদণ্ড বা মূল্যবোধের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নর এবং বিশেষভাবে নারীর জীবন চর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন, "বিষবৃক্ষ" (১৮৭৩ খ্রীঃ) ও কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ (১৮৭৮ খ্রীঃ)।

ব্যক্তির কামনা-বাসনা ও প্রেমাবেগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্ধনহীন মুক্ত ও উদার সমাজ-নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন "নষ্টনীড়" (১৩০৮ বঙ্গাব্দ । ১৯০৩) ও 'চোখের বালি' (১৩০৮ - ৯ [illegible]/ — ১৯০৪) উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুক্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির কত পার্থক্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ — ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" (১৯০৩ - ৪) উপন্যাসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন — শরৎচন্দ্রের উক্তি —" ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। .... কোন কিছু যে এমন করে বলা যায় অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয় নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।" [১৩]

সমাজ চেতনা-অবদমিত আর ব্যক্তি চেতনার শক্তিপূর্ণ উন্মেষ পর্বে প্রাচীন প্রথা-সিদ্ধ বন্ধন-মুক্তির মাহেন্দ্রক্ষণে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর প্রেমের ও প্রাণের স্ফূর্তিপূর্ণ লীলাকে স্বীকৃতি দিয়া আহ্বান করিয়া বরণ করিয়া লইলেন —" চোখের বালি" (১৯০৩ - ৪) "নষ্টনীড়" (১৯০৩)" নৌকাডুবি" [(১৯০৬) নর-নারীর প্রেমাপ্রেম সম্পর্কের জটিলতা], "গোরা" (১৯০৯ - ১০) উপন্যাসে। এই উপন্যাসগুলিতে নর-নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে হলেও মানুষ হিসাবে দেখিতে হইবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ে উভয়েই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রথাসিদ্ধ নীতির দ্বারা ইহারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের হইয়াছিল। উপন্যাসেও সেই উপলব্ধি-জাত মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে

মনে হয় । তার এই রচনাগুলিতে ব্যক্তিচেতনার মনস্তত্ত্ব মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে । 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) ও উপরি-উক্ত রচনার চরিত্রগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দীপ্ত — এই উজ্জ্বলতা রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কোনো উপন্যাসে অনুপস্থিত । এই চরিত্রগুলি বস্তুত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের 'Turning point' — মনে হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত আধুনিক চরিত্রগুলি 'নবযুগের সৃষ্টি' । শরৎচন্দ্র মনে-প্রাণে 'নবযুগের সৃষ্টি'কে স্বাগত জানাইয়াছিলেন — অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন । সমাজ অননুমোদিত নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের রচনায় অনুপস্থিত ।"বড়দিদি" (১৯১৩) ও"পল্লীসমাজ" (১৯১৬) বিধবার প্রেম চিত্রিত কিন্তু তাহা ব্যক্তি হৃদয়ে সমাজ-সত্তার দ্বারা পীড়িত — এই প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত হইলেও প্রকাশ করা গর্হিত ইহাই যেন প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ শরৎচন্দ্র যেন খানিকটা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ও প্রাচীন ধারা মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রীয় ধারার অনুসারী বলিয়া মনে হয় । শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের রচনায় ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । — আবার মনে হয় শরৎচন্দ্রের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব যদি কিছু থাকে তাহা কেবল উদার ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যেমন 'কিরণময়ী' ('চরিত্রহীন'— ১৯১৭) ও 'অচলা' ('গৃহদাহ'— ১৯২০) চরিত্র দুয়ে অন্তত পাশ্চাত্য নারীর জীবনচর্যার আদল দুর্লক্ষ্য নয় । বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপর পড়িতে থাকে —"১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অর্থাৎ "চোখের বালি " (১৯০৩ - ৪) এবং গল্পগুচ্ছ প্রচারের পর হইতে — যখন হইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ — ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাবলী পাঠের সুযোগ পান তখন হইতে — রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িতে থাকে । তবে বঙ্কিমের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই । বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ শুধু সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস-গল্পেই আবদ্ধ , ইতিহাসের দিকে প্রসারিত হয় নাই । বঙ্কিমচন্দ্র যে দৃষ্টিতে বাঙালী সমাজকে দেখিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, কেন না তাঁহার জীবনের পথ বঙ্কিমের মত সহজ ও সরল ছিল না ।"[১৪] তবে উভয়ের এখানে মৌল সাদৃশ্য আছে দৃষ্টিভঙ্গিতে — উভয়ে সমসাময়িক সমাজ-বন্ধনের বেড়া - ভাঙিতে দ্বিধাগ্রস্ত । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ দৃশ্যতঃ ক্লাসিক্যাল মনোভাবাপন্ন । ক্লাসিক্যাল মনোভাব অনুযায়ী সমাজ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় , তাই সমাজের অনুশাসন ব্যক্তির উপর অবশ্য প্রযোজ্য — এমন কি প্রয়োজন হইলে সমাজ-ব্যক্তিকে পীড়ন করিতে পারে । তার রোমান্টিক মনোভাবের কাছে ব্যক্তি সমাজ অপেক্ষা বড় — এই কারণে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষের সময় ব্যক্তি লেখকের সহানুভূতি লাভ করিয়া থাকে ।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র-অনুসৃত রূপ মুখ্যত রোমান্টিক

দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য নাই তাঁহাদের জীবনে ভালোমন্দের মৌলিক আদর্শ মোটামুটি এক রকমই ছিল। তবে পার্থক্য এই খানে যে বঙ্কিমের নীতিবোধ ছিল শাস্ত্রশাসিত, পুঁথিগত অনুশাসন আর শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ ছিল হৃদয়-অনুভূত উভয়দিকের মুখ চাহিয়া শরৎচন্দ্র সমাজকে কখনও লঙ্ঘন করিতে চাহেন নাই। সমাজ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা তাঁহার লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে —"একজন পাড়া গাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে — পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অতএব আমি নাড়াচাড়া করিতে চাহি এই মোটা বস্তুকে লইয়াই। যে সমাজে মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হাত বাঁধিয়া বসে; কাজকর্মে হাতে পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়, উৎসব-ব্যসনে আহ্লাদও করে, বিবাদও করে, যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয় — আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং সেই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি।"[১৫] এই সমাজেরই চিত্র শরৎচন্দ্রের "পল্লীসমাজ" (১৯১৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে পাওয়া যায় — এই সমাজ জাতিভেদচালিত অনুদার ও শিথিলায়মান দলগত পল্লী সমাজ। কিন্তু সমাজ সংস্কার সমর্থক ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্র কখনো প্রসন্ন ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের ভাবনায় সমাজ সংস্কার বিমুখতা ও ব্রাহ্মসমাজ বিদ্বেষ পরস্পরানুষঙ্গী ছিল। কোনটি হইতে কোনটি জন্মিয়াছিল নিঃসন্দেহে বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের মতাদর্শে অন্যায়-অসংগতি সত্ত্বেও সমাজধর্মকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই মতাদর্শই শরৎচন্দ্রের রচনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষ হইতে রচনা বঞ্চিত হইয়াছে। শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র তাঁহার সমাজ সম্বন্ধে ধারণার অসম্পূর্ণতা ও অসংগতি লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য শিল্পে ত্রুটি সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যেমন 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১)-এ কমল চরিত্র। এই সময় তাঁহার রচনা শক্তি অনেক নির্বাণোন্মুখ।

শরৎচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর ছিল ১৩০৮ সাল পর্যন্ত। বঙ্কিম উপন্যাসের কার্যকরী প্রভাব শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য রচনাও শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল — শরৎচন্দ্রের গদ্যরচনা 'কুকুর গৌরব' (১৩০৮) প্রকাশ যমুনা মাঘ ১৩২০ বঙ্গাব্দে ও 'গুরুশিষ্য সংবাদ' (১৩০৮ ?) প্রকাশ যমুনা ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দ — বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরেরই আর এক জের

বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্রের ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের রচনায় কখনো কখনো প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ – ১৯৩২) ও জলধর সেনের (১৮৬০ – ১৯৩৯) প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' কাহিনীর মূলে প্রভাত কুমারের 'স্টাইল'-এর অনুবর্তন ও উপসংহার রবীন্দ্র-গল্প রচনারীতির অনুসারী। ইহা ব্যতীত 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬) উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে কবিগুরুর 'ত্যাগ' ও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশীবাসিনী' গল্পের এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩ – ১৯১৩) 'পরপারে' নাটকের নিশ্চিত প্রভাব বর্তমান 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে (১৯১৬) 'সরযূ', 'দয়াল', 'বিশ্বেশ্বর' আছে — 'পরপারে' নাটকেও এই নাম আছে। "স্থান স্থান ভূমিকায় জলধর সেনের বিশুদাদা'র ও কবিগুরুর 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রাক্-শরৎচন্দ্র পূর্বসূরীদের রচনার প্রভাব ও প্রতিচ্ছায়া অনুসরণ করিয়া সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গল্প উপন্যাসগুলিকে প্রধানত চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এই পর্যায় বিভাগ নিখুঁত ভাবে কালানুক্রমিক নয়। প্রথম পর্যায় বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত রচনা — দেবদাস (১৩০৮ ? ইংরাজী ১৯১৭), পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪) 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), দত্তা (১৯১৮), দেনাপাওনা (১৯২৩) 'পথের দাবী' (১৯২৬)। শরৎচন্দ্রের উক্তি - উক্ত উপন্যাসের রসবস্তু যেন ইতিহাসাশ্রিত কালোপযোগী পাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে। 'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসে পার্বতী ও দেবদাসের বাল্য-প্রণয়। বিবাহের পর না পার্বতী বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে — 'রজনী' উপন্যাসের ভাব-প্রভাব ইহাই। দেবদাসের আদর্শ 'রজনী' বলিতে দ্বিধা হয় না। পরিণীতার ললিতা - শেখর প্রেম-লীলা বঙ্কিম চন্দ্রের 'রাধারাণী' (১৮৮৬) উপন্যাসে ধনী যুবকের প্রেম-প্রণয় মনে করাইয়া দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দ্বয় 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ও 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) -এর অতি ক্ষীণ ছায়া 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) – উপন্যাসে বর্তমান।

'শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬), চন্দ্র শেখর (১৮৭৫) উপন্যাসের বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি ও গভীরতার দিক দিয়া মিল আছে। 'পল্লীসমাজ'-এ রমা (বিধবা)-রমেশের বাল্য-প্রণয় 'চন্দ্র শেখর'-এর প্রেমাবেগ ও তদনুযায়ী আচরণ স্মরণ করাইয়া দেয়। আর চন্দ্রনাথের (১৯১৬) সঙ্গে ইন্দিরা (১৮৭৩) উপন্যাসের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না 'দত্তা' (১৯১৮) উপন্যাসে ধনীর অনূঢ়া কন্যার জন্য দুই সম্ভাব্য নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

'দুর্গেশনন্দিনী'-র (১৮৬৫) কথা মনে করাইয়া দেয়। শরৎচন্দ্রর 'দেনা-পাওনা'-র (১৯২৩) ষোড়শী ও দেবীচৌধুরাণীর (১৮৮৪) দেবীরাণীর সাদৃশ্য আছে — উভয়েই স্বামী পরিত্যক্তা এবং উভয় নায়িকা দেবস্থানের তত্ত্বাবধান করিয়াছে। 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২) ও 'পথের দাবী' (১৯২৬) মধ্যে ভাবের দিক দিয়া সাদৃশ্য আছে — তবে আনন্দমঠের কাল ও পথের-দাবীর কাল এক নয় — ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের বিশ ও তিরিশ দশকের ব্যবধানে যে অনেক ভাব ও ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। চিন্তাধারার নূতন গতি সৃষ্টি হইয়াছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রর রবীন্দ্র-ভাবিত রচনাগুলি হইতেছে 'মন্দির', 'বড়দিদি' (গল্প), চরিত্রহীন (১৯১৭); অরক্ষণীয়া (১৯১৬), 'গৃহদাহ' (১৯২০) ও 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। শরৎচন্দ্রর চরিত্রহীন (১৯১৭) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালির' (১৯০৩) অনুকরণ বলিলে হয়ত অসঙ্গত হইবে না। রবীন্দ্রনাথ "স্ত্রীর পত্র" রচনা করেন (১৯১৪ খ্রীঃ)। শরৎচন্দ্রর অরক্ষণীয়ায় (১৯১৬) স্ত্রীর পত্রের ইঙ্গিতই মনে হয়। "গৃহদাহ" (১৯২০) উপন্যাসে "গোরা"র (১৯০৯ - ১০) আভাস আছে এবং 'বিপ্রদাস'-এ (১৯৩৫) 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের ক্ষীণ ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয় — একথা স্থূলবিচারে হয়ত স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে শরৎচন্দ্রর দ্বিতীয়তঃ সক্রিয় উপন্যাসগুলিতে যেমন হৃদয়াবেগ। শরৎচন্দ্রর উপন্যাস তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকথাশ্রিত। যেমন শ্রীকান্ত চার পর্ব (১ম — ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় ১৯২৭, ৪র্থ ১৯৩৩)। এই পর্যায় আত্মগোপন সম্পূর্ণ। শরৎচন্দ্রর চতুর্থ পর্যায়ের রচনায় পড়ে 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)। রচনা মনন-প্রমুখ বস্তু-ভারে আপন্ন 'কমল' চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বল আমার মনে হয় যদিও 'শেষপ্রশ্ন' অসম্পূর্ণ তবুও ইহার বক্তব্য ও কমল চরিত্র ভাবী কালের উপন্যাসের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আর এই কমল (শেষ-প্রশ্ন - ১৯৩১) চরিত্র বিবর্তিত হইয়া আধুনিক উপন্যাসের নারী বিশেষ করিয়া নায়িকা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। বিবাহ সম্পর্কের বাহিরে নর-নারীর প্রেমের স্থান ও স্থায়িত্ব কোথায় — ইহাই শরৎচন্দ্রর সমস্যা। বাংলা ১৩২০ সাল হইতে শরৎচন্দ্রর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। — "ভাষার অনুকরণ মাঝে মাঝে তো আছেই, প্লটের (plot) -অনুকরণও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।" কবিগুরুর "ব্যবধান" ও "অনধিকার প্রবেশ" গল্পের নারী ভূমিকায় আদলে শরৎচন্দ্রর অনেক গল্পের নারী চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।'' শরৎচন্দ্রর 'মেজদিদি' (প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দ) গল্পের 'কাদম্বিনী' ও 'হেমাঙ্গিনী' যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের

ফটিকের মামার ও স্ত্রীর পত্র (১৯১৪) গল্পের মৃণালের ছাঁচে ঢালা। 'স্ত্রী - পত্র' (১৯১৪) গল্পটি 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) রচনায় যে প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর (১৯১৬) আদর্শ যোগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পণ-রক্ষা'। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' (প্রথম প্রকাশ নারায়ণ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) অনুসরণে পরিকল্পিত।"[১৬]

শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), ও 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসে নারী - নিগ্রহের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই নারী-নিগ্রহ যে সময়ে উপন্যাসগুলি লিখিত হইয়াছিল বোধ করি তাহার ষাট-সত্তর বছর পূর্বের বাঙালী সমাজে বিশেষ করিয়া পল্লীবাংলায় নারী-নির্যাতন ঘটিত। বিশ শতকেও এই নারী নিগ্রহ যে হয় না এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। শরৎ পূর্ববর্তী লেখকবৃন্দ সমাজের হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার স্বরূপটি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই। শরৎচন্দ্রও এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলত অনুসরণ করিলেও জীবন-সায়াহ্নে সমাজ সম্মুখে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিতেন — 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) 'কমল' চরিত্রে সেই বিদ্রোহ - বহ্নির ঊর্ধ্ব শিখার স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্র বস্তুত ঐতিহ্য মুক্ত লেখক নহেন — যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া প্রবাহিত শরৎচন্দ্র বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের মিলিত ধারার উত্তর সাধক বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গুরুতর। 'চোখের বালি' (১৯০৩) বিনোদিনীর আদর্শ উন্নত করিতে চরিত্রহীন (১৯১৭)-এর কিরণময়ীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তথাপি মনে হয় শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট হয় যে তাঁহার মধ্যে পুরাতন ও নূতন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুই ধারার যুক্ত প্রবাহ চলিয়াছে।

বস্তুত শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের উপন্যাসে বঙ্কিম-অনুগামিতা থাকিবার ফলে পুরাতন রক্ষণশীল ধারার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইগুলি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। নর-নারীর প্রেমাবেগ এই পর্বের উপন্যাসে প্রধান ও মুখ্য স্থান পায় নাই। সমাজ-নিন্দিত প্রেমের স্থান অন্তরে,গৃহে ও সংসারে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠা অনুচিত। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র এই প্রথম পর্বের রচনায় সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধ মানিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস "বিপ্রদাস" (১৯৩৫)-এ প্রাচীন সমাজের রক্ষণশীল মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ফুটে উঠে বলিয়া অনুমিত হয়। মনে হয় শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কার বিমুখ ছিলেন — হয়ত এই কারণেই সমাজ-সংস্কার সমর্থক ব্রাহ্মদের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'শ্রীকান্ত' (১৯৩৩ ৪র্থ পর্ব), 'গৃহদাহ' (১৯২০) ও 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়। ব্যক্তির তথা নরনারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধিকার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নির্দেশিত পথই যেন পরবর্তী কালে বাংলা উপন্যাসের উত্তর সাধকদের পথের নিশানার ইঙ্গিত দিয়াছিল। তারাশঙ্করের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য —"শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে (১৯৩৮) — রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে, তবুও বাঙালী জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবধারা।"[17] তার এই ধারারই নানা বিচিত্র প্রবাহ - উপপ্রবাহ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাংলা উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় - তার রবীন্দ্রনাথের ধারাও অনুসরণ সাহিত্যে উত্তর সাধকের হাতে নব রূপ, নববেশ পাইল।

শরৎচন্দ্র (১৮৭৬ - ১৯৩৮) বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮ - ১৮৯৪) ও রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১ - ১৯৪১) রচনার পরম ভক্ত ছিলেন — এই কারণেই এই দুই জন মনস্বী বাঙালী লেখকের প্রভাব তাঁহার উপর গভীর ভাবে পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল — একটি ভাষণের (শরৎচন্দ্রের) অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, — "উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়।"[18] শরৎচন্দ্রের স্বীয় স্বীকারোক্তিতে বঙ্কিম-প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত করাইয়াছেন — তার রবীন্দ্র-প্রভাব বোধ করি গুরুতর ও দুর্বার বলিয়াই বাক্‌-বৈপুল্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —"আমার চাইতে ওঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, — আমার চাইতে ওঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে — আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করে নি ওঁর লেখা। ----- আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি ওঁর উপন্যাস — ওঁর 'চোখের বালি' (১৯০৩ - ৪), ওঁর 'গোরা' (১৯০৯) ওঁর গল্পগুচ্ছ।"[19] শরৎচন্দ্রের মানসিক গঠনের যে উপাদান মুখ্য তাহা বঙ্কিম-ভাবিত ও রবীন্দ্র-প্রভাবিত। তার সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আসিয়াছে জীবনের অভিজ্ঞতার মর্মমূল

হইতে সৃষ্ট উপলব্ধিজাত ও প্রত্যয় বোধে রচিত। পাশ্চাত্য জীবনবোধ বা বিদেশী সাহিত্য হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে আসে নাই। তাই শরৎচন্দ্র খাঁটি বাঙালী লেখক। যুগের যুক্তিতায় এই বিশৃঙ্খলতার মূল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (শেষ পর্বের) সাধারণ মানুষের জীবন রচনায় [illegible] কারণ সম্ভবত এই পর্বের উপন্যাসগুলি তত্ত্ব ও আদর্শবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার উপন্যাসে বিশ্বের সাধারণ মানবতাবোধের প্রকাশ হলে আবেদনও স্থান-কাল-সীমা ছাড়াইয়া বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে ? রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে সর্ব দেশের সর্বকালের সর্বমানবের তৃষ্ণা মিটাইবার লেখক। রবীন্দ্রনাথের কোন কালান্তর নাই — রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের। কিন্তু শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই বাংলাদেশের বাঙালীর ঘরের সুখ দুঃখ প্রেম-বিরহ বেদনার নিপুণ কথাশিল্পী তাই তাঁহার রচনায় রবীন্দ্রনাথের মত ব্যাপকতা ও পরিবেশগত বিস্তৃতি অনুপস্থিত। তবে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট চরিত্র প্রায় সবই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তায় সমাজবন্ধন ও সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে — যেমন "গোরা, সুচরিতা শচীশ, দামিনী, অমিত , লাবণ্য, কুমুদিনী, নিখিলেশ সন্দীপ ও বিমলা আপন আপন প্রাণ-রহস্যে প্রতিবেশীদেরকে লঙ্ঘন করিয়াছে।" [১০] শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গল্পে যেমন 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) 'অভাগীর স্বর্গ' কাহিনীতে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা থাকিলেও তাঁহার মুখ্য আলোচ্য হইল বিবাহ-সম্পর্কের বাহিরে নরনারীর প্রেম ইহার স্থান ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সমস্যা ও জটিলতা। বাঙালীর সমাজ ও ইহার নৈতিক দিকটির প্রতি শরৎচন্দ্র সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন ছিলেন না। সমাজের প্রতি তিনি 'নৈতিক' দিক হইতে আঘাত করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন সমাজের 'উচ্চ তলার' বাসিন্দা — পতির আদর্শ ও কাব্য কল্পনায় ইহারা যেন অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে — শরৎচন্দ্র বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের মুখ্যত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের জীবন সমস্যার রূপকার এই কারণেই তিনি গণজীবনের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন — সাহিত্যে গণতন্ত্রীকরণ এই পর্বেই শুরু হয় — মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ভিড় — যেমন 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিত মশাই' (১৯১৪) 'বৈকুণ্ঠের - উইল' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'শুভদা' (১৯৩৮), ও 'বিলাসী' 'মামলার ফল', ও 'মহেশ'। এই রচনায় শরৎচন্দ্রের

সহানুভূতি ও সমবেদনা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে । তাঁর 'নববিধান' (১৯২২) 'দত্তা' (১৯১৮) ও 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) উপন্যাস ত্রয় ধনী-নরনারীর চরিত্র আছে তবে তাহারা প্রত্যেকেই পড়ন্ত মধ্যবিত্ত মানসিকতার অংশীদার । উপরি-উক্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি (গোরা, শচীশ, নিখিলেশ, ফণীশ অমিত, সুচরিতা, দামিনী, লাবণ্য) যেন অসাধারণ তাহাদের বিকাশ মধ্যবিত্ত দরিদ্র বাঙালী সমাজে অনুপস্থিত যদিও তাহাদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য — ইহারা কেহ কবির কল্পনামাত্র বাস্তব আবার কেহ ভাবীকালের বার্তাবাহী পূর্বরঙ্গ এর চরিত্র । উত্তরকালের সাহিত্য সাধকবৃন্দ উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিবার বড়াই করিতেছিলেন । সমান বা উত্তীর্ণ তো দূরস্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই করে তো সবই স্থির করা । এই সত্য অপরিশোধ্য — পরে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎ সমসাময়িক তরুণ লেখককুল বিলম্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তবে রবীন্দ্র-শরৎ প্রভাব ও সংস্কারে বাংলার সাহিত্যধারা দীর্ঘকালের জন্য মূর্ছিত হইয়া গিয়াছে — তাই সেই ধারারই নানা শাখা প্রশাখা অতি আধুনিকের হাতে নবকলেবর ধারণ করিয়া বাংলা উপন্যাসের নানাচারী প্রবৃত্তি প্রবণতা ও পরিবেশ সৃষ্টি ~~উপন্যাসে~~ করিয়াছে । লেখক ত্রয়ীর পৃথক পৃথক অধ্যায়ে এই বৈচিত্র্যের সম্ভাব্য আলোচনা করা হইয়াছে । এই অংশে তাহারই সামান্য ইঙ্গিত প্রদত্ত হইল । রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও শরৎ সমকালীন পর্বে অনেক তরুণ লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই জন্ম মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক অথবা বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে । এই কালপর্বে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল যাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল বিংশ শতকের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০ - ২১) পূর্ব হইতে ফলিতে শুরু করে । এই সম্বন্ধে এই নিবন্ধের প্রথম অংশে আলোচিত হইয়াছে । তাই তরুণ লেখকবৃন্দ কাল ও ঘটনা বৈগুণ্যের প্রভাব- কবলিত । সেই কারণেই এই তরুণ গোষ্ঠী ও লেখকবৃন্দের মানসিকতা অনেকাংশে প্রতিবাদী নৈরাশ্যের ও সংশয়াচ্ছন্ন — "ধ্যানী ঋষি দৃষ্টি"র অভাব লক্ষ্য করা যায় । ইহারা কেহই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমস্তরভুক্ত শিল্পী ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই । ইঁহারা জীবনের তাৎপর্য অন্বেষী । দৃশ্য ও অপরিচিত বা দুর্লভ লোকের জীবন বা নরনারীর মনের অবচেতনার গহন রহস্য লোকের অনালোকিত অংশে সন্ধানী আলোকপাত করিয়া জীবনকে খণ্ডাংশে বুঝিতে তৎপর হইয়াছিলেন — যদিও "খণ্ডত্ব" মধ্যদিয়া সমগ্র জীবন

সত্যের সন্ধান করাই তাঁহাদের অভীষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ হয়ত কালগত বৈগুণ্য। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যদি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জন্ম লইতেন তবে তাঁহাদেরও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনীনতা বা জীবনের সমগ্রের সন্ধানী হইত না। এই বক্তব্য বা যুক্তিধারার সমর্থন প্রখ্যাত সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি —"আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুষ্কর। ফাটল তখনই ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্মরেখা তখনও সমগ্রতার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই —, এমন কি সে সূক্ষ্মতা অধিকাংশ-লোকেরই চোখে পড়ে নাই। এ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, ব্যবহারিকভাবে তখন সমগ্র বাঙালী সমাজ অখণ্ড অতএব এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলে, সুতরাং তাঁহার কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী জীবন। একদিন অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া যে নির্ঝরিণী বিশ্বের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে যেন সমগ্র বাঙালী-জীবন বরফগলা জলের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যের ভিত্তিপ্রশস্ততর হইতে হইতে, ক্রমে অধিকতর ভূমি গ্রাস করিতে করিতে বিশ্বের পাদপীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্ঝরের সঙ্গে দেশবিদেশের ধারা মিশিতে মিশিতে তাহা বিশ্বের রসভাগীরথী হইয়া পড়িয়াছে। কোনো কবির কাব্য বিচারের পক্ষে তাহার প্রাথমিক ভিত্তিটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাথমিক ভিত্তি তাঁহার সামাজিক ভিত্তি; তাঁহার জাতির ভিত্তি যে মাটিতে ভর করিয়া কবি প্রথমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই মাটির দৃঢ়তা ও উদারতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ জাতির এমন এক শুভক্ষণে জন্মিয়াছিলেন, যখন হিন্দু বাঙালী-সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। তার মাটির দৃঢ়তা। বাংলাদেশের পলিমাটি অবশ্য নরম কিন্তু তাহার তলে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বজ্রকঠিন গ্রানিটস্তর। বাঙালীর জীবন অবশ্য চিরকালই ভাবালুতায় দোলায়মান, কিন্তু তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বহু যুগসঞ্চিত তপশ্চর্যার কঠোরতা।" [২১]

"রবীন্দ্রনাথ আর যদি পঁচিশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন, কিংবা ত্রিশ বছর পরেও, প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এমন মহত্ত্বলাভ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই অল্প কালের মধ্যে প্রাথমিক ভিত্তির উদারতা যে অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবিমাত্র হইতে পারিতেন — কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন কিনা সংশয় ....

সর্বজাতীয়তার ভিত্তি জাতীয় জীবন ; নিখিল মানুষের আশ্রয় দেশের মানুষ ; বনস্পতির চারাটিরও প্রথমে একখানি বাঁশের কঞ্চি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হয় । একথা আমরা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাই — বিধাতাপুরুষও মানব প্রকৃতি এই অতি-প্রাথমিক সত্যটা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না । সেই জন্যই বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যে সেই যুগে জন্মিয়া মহাকবি হইবার পাদপীঠ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সৌভাগ্য । প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যতদিন না আবার শতদীর্ণ বাঙালী সমাজ জোড়া লাগিতেছে ততদিন বাঙালী জাতির মধ্যে আর মহাকবি হইবার সম্ভাবনা নাই । শক্তিমান লেখকের শক্তির অনেকটাই এই কঠিনপথে রসাতলে চলিয়া যাইবে ; যে রসে সে পুষ্ট হইতে পারিত তাহা তাহার কোনো কাজে লাগিবে না ।"[২২]

"একালের দিনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে শহরে গ্রামে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তিতে সমাজ বহুখণ্ড হইয়া গিয়াছে ; একের সঙ্গে অন্যের যে যোগ নাই, তাও তাহা নয়, — একটি অন্যের পরিপন্থী । এখানে কেহ কেহ জাতি ভেদের প্রশ্ন তুলিতে পারেন, সে ভেদ কি ভেদ নয় ? জাতি ভেদের ভেদ দাবার ছকের নানা রঙের ভেদের মতো — সবটা মিলিয়া তবেই তাহার সমগ্র চেহারা ; ঐ ভেদটুকু আছে বলিয়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ সাজিয়া খেলা চলে — সব একাকার হইলে কোনো কাজ চলে না । আসল কথা বহুকাল হইল আমাদের সমাজ জাতি ভেদটাকে তাহার ভালো মন্দ সুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ চালাইবার মত একটা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল ; — আদর্শের বিচারে যতই খাটো ছিল — কিন্তু কোনো রকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত — একেবারে ছেদ রেখার উদ্ভব হয় নাই । এই ছেদ রেখার উদ্ভব হইল অন্য প্রকার ভেদে — ভারতীয় জীবনের উপর য়ুরোপীয় জীবনের সংঘাতে । ভারতীয় মনের উপর য়ুরোপীয় মন আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজ চৈতন্যের উপরে যখন য়ুরোপীয় ব্যক্তি চৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এদেশের শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহুরে গ্রামে ব্যবধানের ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল । য়ুরোপ বা আধুনিকতার সমুদ্র আজ চার শ বছর বেগে পাড়ি ধরিয়াছিল, কালের দৈর্ঘ্যের জন্য তাহার জীবনে যে পরিবর্তন ক্রমশ ঘটিতে আসিয়াছে, আমরা অত্যল্প সময়ে সেই আধুনিকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম । এক বিরাট একটা আধুনিকতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিব কি উঠিব জানি না — ইহার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া রচনার চরম শিল্প সৃষ্টির সুযোগ কোথায় ? রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ কিশোরে ও যৌবনে এই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন নাই । তিনি সিন্ধুতলের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া, সমাহিত হইবার

সমগ্রটাকে দেখিবার .... আত্মস্থতালাভের সুযোগ পাইয়া ছিলেন। একালের বাঙালীর মতো সবটা মনোযোগ কেবল নিজের জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই। আর তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি এক মনে আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের দুই কথারই দেখিয়াছেন"[২৩]। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কথাকার ও য়ুরোপ - প্রভাবজাত নবীন-ধারা-জাত কথাকার।

এখন আমাদের সামাজিক মনের বদল হইয়া গিয়াছে। মনের দিক দিয়া আচার - ব্যবহারের দিক দিয়া অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। সমাজচেতনার সূত্রটি ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে ব্যক্তি সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে — সে বড় একা। কেমন এক বিচ্ছিন্নতাবোধ (sense of isolation) ব্যক্তির চেতনে নিয়ত ক্রিয়াশীল। ব্যক্তির পায়ের তলায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই — সামাজিক ভিত্তি ও জাতীয় ভিত্তি — কিছুই নাই — ব্যক্তি যেন শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কু। ম শহর-বাসীর এই অবস্থা - গ্রামও ভবিষ্যতে প্রায় একই প্রভাবাধীন হইয়া পড়িবে। আধুনিক উপন্যাসে ইহারই প্রতিচ্ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। আলোচ্য লেখকবৃন্দ বুদ্ধদেব - অচিন্ত্য - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা - সাহিত্যে বিশেষ করিয়া উপন্যাসে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক অধ্যায়ে (বুদ্ধদেব - অচিন্ত্য - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অংশে) আলোচিত হইয়াছে। কল্লোলগোষ্ঠীর নানাচারী প্রবণতা, প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি রবীন্দ্রনাথ অনুসারী হইলেও তাহা যুগবৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে তার যে কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের সমগ্রতার সন্ধানী আর ওই একই কারণের অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রসমকালীন লেখকবৃন্দ জীবনের সামগ্রিকতার সন্ধানী হইতে পারেন নাই — তাহাদের শক্তি ও প্রতিভার অনেকখানিই যে দেশ-কালবিশৃঙ্খলা কণ্টকিত হইয়াছে — ইহা তাহাদের দুর্বলতা বা অসামর্থ্য নয় বরং কাল - বৈশৃঙ্খলা কণ্টকিত হইয়াছে — ইহা তাহাদের দুর্বলতা বা অসামর্থ্য নয় — বরং কালবিশৃঙ্খলা কবলিত হইবারই অন্যতম পরিণতি। রচিত উপন্যাসেও সেই শূন্যতাটি প্রকাশ হইয়াছে। তার রচনায় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই সেই নষ্ট সামাজিক ও জাতীয় ভিত্তির অবচেতন অভাব- মোচনের প্রয়াস। ইঁহাদের অবস্থা অনেকাংশে শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কুর মতো ইঁহারা যে দেশ ও সমাজে বাস করিয়া জীবন রস আহরণ করিয়া সৃষ্টির রসভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন সেখানে যে পূর্ব হইতেই মোটামুটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতেই, সমাজ রচনায় খণ্ডীকরণ দেখা দিয়াছিল — সমাজ চেতনার সূত্র প্রায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল

ইহার কারণ বহুবিধ এই নিবন্ধের প্রথমাংশে উল্লেখ করিয়াছি । তাই ব্যক্তি যেন "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের শুষ্ক বৃন্তে বুদ্বুদের পুটি ; সমগ্র সমাজমানের তার দেখা পাই না — শুধু যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ।"[১৪] বস্তুত এই কারণেই ইহাদের রচনায় সমাজ-বিযুক্ত ব্যক্তির আশা-নিরাশা বেদনা-হাহাকার প্রেমাবেগ ও যৌনক্ষুধা প্রভৃতি অস্বাভাবিক মানুষের মানসিকতে ধ্বজিভূত সমাজ চেতনা পীড়িত অদ্ভুত জীবনের মত তাহাদের রক্তপ্রবাহে মর্দিত হইয়া ফিরিতেছে । এই বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় বা 'কন্টিনেন্টাল' সাহিত্যের প্রত্যক্ষপ্রভাব ও প্রকাশজাত । তার রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া নূতন সাহিত্য - সৃষ্টি করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা — স্বতঃস্ফূর্ত কবি-ভাবনায় বা স্বাভাবিক শান্ত সমাহিত ঋষি দৃষ্টির কল্যাণ-প্রাপ্ত জীবনের আলোয় অনুপস্থিত । আধুনিক ~~কল~~ নামধারী সাহিত্যসেবীরা রবীন্দ্রনাথের মত কোন 'নবযুগ' সৃষ্টি করিতে পারেন নাই । সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তনা করিতে তাঁহারা ব্যর্থ — এই ব্যর্থতার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । আধুনিক লেখকেরা কম বেশি শক্তিমান তবে তাঁহাদের রচনার ভাব প্রায়ই বিদেশের ধার করা — যে সমস্যা তাঁহারা উপস্থাপন করিতে চাহিতেছেন তাহা স্বদেশে সামাজিক বা পারিবারিক পরিবেশে সঙ্কটরূপে ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই । ইহাদের সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন — "আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, য ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । আমাদের দেশের চেতনায় যে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই — এবং তাহারা অনেকখানি আমাদের আমন্ত্রণের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই । তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে । .... তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসাবে তেমন শ্রেষ্ঠ নয় ।"[১৫]

সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্বথা ও সর্বদা উদারতম ভাবক । অতি - আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহাদের রচনায় ক্ষমতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন — একথা প্রসঙ্গান্তরে [illegible] অংশে উল্লেখ করিয়াছি । তবুও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ''অতি-আধুনিক''দের অপ্রসন্নতা একরূপ স্পষ্ট ছিল — অচিন্ত্যকুমার - বুদ্ধদেব ব্যতীত আরও ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার । এই শেষোক্ত দুইজন আমার আলোচনায় বহির্ভূত বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না । ইঁহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরকে রবীন্দ্র-রচনা মুগ্ধ বাঙালী পাঠক সমাজকে । স্বীয় শক্তিতে অগাধ বিশ্বাসের জন্য তাঁহাদের ধারণা হইল —" যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন । ইহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের কবিতা 'আবিষ্কার' — অর্থাৎ আত্মাবিষ্কার ।"[২৬] এই কবিতাটি অচিন্ত্যকুমারের প্রথম (?) রচনা । — প্রকাশিত হইয়াছিল কল্লোল পত্রিকায় কার্তিক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে । কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি ।

"এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু .... ।
'পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো
সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্রঠাকুর, —
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিবে যে তীব্র আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে । মোর পথ আরও দূর ।
...   .
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি — নবীন প্রেরণা ।'
আপনাকে তাই নমস্কার ।
চক্ষে থাকে আয়ু ঊর্মি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী ;"[২৭]

মোট কথা সে সময়ে অবধারিত রবীন্দ্র বিদ্বেষ না থাকলেও রবীন্দ্র বিমুখতা ছিল অনেকের মানসিকতায় । লজ্জার সহিত বলিতে হয় এক সময়ে (সুশীল কুমার দে ও মোহিত লাল মজুমদারের প্রযত্নে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রকে ও কাব্যে মধুসূদন দত্ত ও নজরুল ইসলামকে সাদরে স্থান দিয়াছিল — অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনা যে অপাংক্তেয় । অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব উভয়েই এই ঢাকাই রবীন্দ্র আবহাওয়ায় বিমুখতার বাতাসকে তাহাদের সাহিত্য সাধনার পালে লাগাইয়াছিলেন । তবে এই বিমুখতার হাওয়া তাঁহাদের সাধনার পক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়াছিল । ওই সব তরুণ সাহিত্য - সেবীর আন্তরিক ভাবে মানসিকতায় ছিল কিছু রবীন্দ্র-বিমুখতা আর কিছু ছিল শরৎ - প্রীতি । তবে ইহাদের শরৎ-প্রীতিই যথার্থই আন্তরিক । বঙ্কিম - নীতি বাগীশ, রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক আর এই দুই বিপরীত স্বাদের স্বাদু মিশ্রণ হয়ত শরৎচন্দ্রের রচনায় তাঁহারা পাইয়াছিলে — তাঁহারা হয়ত জানিতেন না যে শরৎচন্দ্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্র

ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। সেসময়ের (কালি-কলম ভাদ্র ১৩৩৪ — প্রগতি ১৩৩৬ আষাঢ়) প্রবীণ ও নবীন উভয় দলই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে তারিফ করিতেন। যদিও শরৎ-রচনায় পাশ্চাত্য - সাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান নয় তাহার মূল যে স্বদেশেই — এই দেশেই উত্তরাধিকার সূত্রে শরৎ চন্দ্রের প্রেরণা — এই গূঢ় তথ্যটি তাহাদের জানাছিল না।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি তরুণ সাহিত্যিকেরা শরৎচন্দ্রের মত পড়িয়া অনুপ্রাণিত হন নাই। রবীন্দ্র উপন্যাসের রস-গ্রহণে অসমর্থ, তবে কবিগুরুর গদ্য কবিকা 'লিপিকা' পড়িয়াছিলেন। রচনার 'স্টাইল'-এর সদ্ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তরুণেরা — ইঁহাদের প্রথম রচনাগুলিতে লিপিকার গুরুতর প্রভাব বর্তমান। এই তরুণেরাই বলিতে ছিলেন রবীন্দ্র যুগ অতীত হইয়াছে এখন অতি আধুনিকতা শুরু হইয়াছে — যুগনেতা# কথা - সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও কাব্যে নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' — (১৯২৯) ও 'বাঁশরী' (১৯৩৩) লিখিয়া ইহার যথার্থ জবাব দিয়াছিলেন। তরুণেরা চমকিত। বুঝিলেন রবীন্দ্রনাথের কালান্তর নাই রবীন্দ্রনাথ চির - নবীন সমকালীন তিরিশ দশকে যাহা রচিত হইতেছিল হয় তাহা রবীন্দ্রানুসারিতা বা পরবর্তী কালে রবীন্দ্র তিরোভাব জনিত 'decadence' অবক্ষয় বা অবসাদ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির অস্বীকৃতি তাহাদেরই দ্বারা যাহারা সেই সাহিত্যেরই (রবীন্দ্র-সাহিত্য) অধমর্ণ 'শেষের কবিতায়' (১৯২৯) এইভাব ব্যক্ত। আর 'বাঁশরী' (১৯৩৩) সেই মনোভাব আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তবে অতি-আধুনিকদের সম্বন্ধে কবি আশা একেবারে ত্যাগ করেন নাই — 'বাঁশরী' (১৯৩৩) গ্রন্থখানি পড়িলে ইহাই অনুমিত হয়। ক্ষিতীশের সম্বন্ধে বাঁশরী লীলাকে বলিতেছে —"অবিচার করিস্‌নে। ওর লেখার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে ভিতরে পোকা থেকেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে।"[২৮]

বস্তুত, "শেষের কবিতার' (১৯২৯) ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জয়ন্তী-উৎসবে (১৩৩৮ সাল) অতি আধুনিকেরা পিছাইয়া থাকেন নাই। "শেষের কবিতার" পর গদ্য কবিতা। তাহা দেখিয়া "নূতন" কবিতার নবীন কবিরা চমকিত হইয়া গেলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের মানিয়া লইতে হইল — মনে মনে না হোক মুখে। প্রতিবাদ ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা এখন নিজেদের নিজেদের ঘাঁটি আগলাইয়া গোষ্ঠী গঠনে ও আত্ম-প্রচারে মন দিলেন। ইঁহাদের সাহিত্য - চর্চা একটু মোড় ফিরিল।"[২৯]

বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" পত্রিকা প্রকাশনার মধ্যেও দলগত ও গোষ্ঠীগত ঘাঁটি আগলাইবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আর এই গোষ্ঠী প্রবণতা তাঁহার আমৃত্যু পর্যন্ত ছিল।

শরৎচন্দ্রের উপর যেমন রবীন্দ্র প্রভাব গুরুতর ঠিক তেমনি নয়; ততোধিক প্রভাব অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব - অন্নদাশংকর আর দিলীপকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদের উপর বিদ্যমান। এই প্রভাব উদার বন্ধনমুক্ত জীবন দৃষ্টির মধ্যে সীমিত। প্রেমেন্দ্র - শৈলজা ও প্রবোধ কুমার সান্যাল যুরোপীয় 'Modernisation' ও 'traditional past' উভয় ধারার মিলিত প্রবাহে দ্বিধাগ্রস্ত কাম্পিত রোমান্টিক ভাবুকতায় বস্তুর ও জীবনের রসভাষ্যবী সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছে না অন্নদাশংকর দিলীপকুমার ও ধূর্জটি প্রসাদ মননের দ্বারা জীবনের সত্য অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন - সেই প্রয়াসের স্বাক্ষর আছে তাঁহাদের নির্বাচিত উপন্যাস ও গল্পে যেগুলির পর্যালোচনার রেখা-চিত্র লেখক কেন্দ্রিক পৃথক পৃথক অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে কল্লোল-গোষ্ঠীর অনেক তরুণ লেখক রবীন্দ্র-প্রভাবে 'eclipsed' হইতে সুরু করিয়াছিলেন — নবীন ও প্রবীন উভয় রবীন্দ্র বিমুখ দলের এই অবস্থা — তাহাদের অনেকের সাহিত্য-সাধনা স্তব্ধ হইয়া যাইত অথবা তাহারা তৎক্ষণাৎ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতেন যদি না শনিবারের চিঠি বিবাদ জিয়াইয়া রাখিত আর তদপেক্ষা বাস্তব কারণ হইল —"কল্লোল পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ব্যক্তি-ভাগীদার আছেন। তিনি ডি.এম লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া কল্লোল-গোষ্ঠীর অধিকাংশের রচনা পুস্তকাকারে ~~[illegible]~~ ইনিই প্রথম ছাপাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত তৎক্ষনাৎ সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত।"[৩৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পর্বে রবীন্দ্র-বিমুখ ছিল। ইহার কারণ অনেকেই জানেন। মোহিতলাল মজুমদার self-style বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা সাজিয়া বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মধুসূদনের সাহিত্যকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া 'বংকিম - মধুসূদন' কাল্ট তৈয়ারী করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন — ইহা অনেকেই জানেন যে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। মোহিতলাল একদা রবীন্দ্রভক্ত ~~মিত্রনে~~ ছিলেন কী কারণে যে রবীন্দ্র বিদ্বেষের বিষ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' (১৯৩৩) পত্রিকায় ভর করিয়া ছড়াইতে চাহিলেন ইহার কারণ অজ্ঞাত।"রবীন্দ্রনাথের আচরণ, তাঁহার রচনা তাঁহার ছবি কোন কিছুই শনিবারের চিঠির অশিষ্ট, কুটিল কটাক্ষের লক্ষ্য এড়ায় নাই। প্রথমেই যাঁহারা ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের একজন মোহিতলাল মজুমদার, নিজেই অল্পকালপরে শিকারীদলে ভিড়িয়া গেলেন এবং ঘুরিয়া-ফিরিয়া রবীন্দ্র

বিদ্বেষ বিষ ছড়াইতে লাগিলেন ।"[৩১] অতি-আধুনিক সাহিত্যকে তুচ্ছ করিবার জন্য অথবা বিদ্রূপ করিবার জন্য শনিবারের চিঠির উদ্ভব । আর এই কাজটি করিতে গিয়া আধুনিক সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল । 'শনিবারের চিঠির' উদ্যোগের মূলে ছিলেন শ্রী অশোক চ্যাটার্জী , শ্রী যোগানন্দ দাস ও শ্রী সজনীকান্ত দাস । প্রবাসী অফিস ইহার জন্মস্থান । ইহাদের গোষ্ঠীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান ও সাহিত্যিকও ছিলেন । তবে তাঁহারা কেহই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বুঝিতে পারেন নাই । আর বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া 'সাহিত্যের মন্থন' চলিতেছিল — নানা প্রকারে কখনও লক্ষ্য অতি-আধুনিক সাহিত্য আবার কখনও লক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । এই মজাদার ব্যাপার দীর্ঘ দিন ধরিয়া ছিল — পরে অবশ্য এই বিমুখতাও বিদ্রূপ পরায়ণতায় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ।

পাশ্চাত্য ধর্ম-সাহিত্যের সঙ্গে যোগ

পূর্ব-সূরী

পাশ্চাত্য - কথা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ :-

বাংলাদেশের তরুণ লেখক - কুল রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া মুক্ত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন — ইহা যেন একধরণের মানসিক বিরাগ — তাঁহারা কি সচেতন ভাবে জানিতেন এই বিরাগ রাগেরই বিপরীতরূপ । তাই ইঁহাদের মানসিকতায় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল — আর জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিরও রকমফের হইল । আর পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহাদের মানসিকতায় একধরণের বৈনাত্তিকতা' (রবীন্দ্রনাথ যথার্থে ব্যবহার করিয়াছেন - পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনাবশ্যক অনুসরণ) সৃষ্টি করিয়া উগ্র আধুনিক হইতে সাহায্য করিয়াছিল অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আধুনিক সাহিত্যসেবীর উপর । পাশ্চাত্য মানসিকতা মধ্য এই সব তরুণ সাহিত্য-সেবী রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্যে 'নবরূপ' ও 'নবধর্ম' প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রবীন্দ্র - শরৎ সমকালীন যুব সমাজ মানসে রুশ বিপ্লব (১৯১৭) এবং ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদদের চিন্তাধারা, যুদ্ধ ও রুশ বিপ্লব জাত সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব অতি মাত্রায় কার্যকরী হইয়াছিল । বাঙালী নব্য যুবক সে সময়ে নূতন চেতনা ও ভাবধারায় মধ্য হইতে সুরু করিয়াছিল । তরুণ লেখক চিত্তে যুগপৎ ফ্রয়েড্ ইয়ুং ভাবিত তত্ত্ব চিন্তা - মার্কস ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদ ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ও ধ্যানধারণার নবীকরণের মুখ্যতম উৎস হইয়া উঠিল । আর পাশ্চাত্যের ও এদেশের সৃজনশীল সাহিত্যেরও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । বাংলা সাহিত্যের সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ যা বিংশ শতকেই ঘটিয়াছে তাহা নহে ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস সাহিত্যেও পাশ্চাত্য প্রভাব স্পষ্ট । বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে ইহা বিদ্যমান । 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাস স্কটের 'Ivanhoe' কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তবে এ প্রভাব বিষয়ে বিতর্ক আছে । বঙ্কিম পূর্ব সূরী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা ধরিয়া লইলেও এক মত হওয়া যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতি ও চরিত্র বিন্যাস অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী কথা সাহিত্যের ধারায় পরিপুষ্ট । এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করিয়াছেন । অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয় । ইহা ছাড়াও 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লর্ড লিটন ও উইলকি কলিনস্ -এর কাছে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচনা সুরু করিয়াছিলেন পাশ্চাত্য ভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঙ্গে স্বদেশী ও স্বদেশের

জীবনবোধের শুভ যোগ ঘটাইয়াছিলেন মূলত বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সমন্বয়ী ও কল্যাণ-ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও আপন অধ্যাত্ম দৃষ্টিরবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে উজ্জ্বল প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ('করুণা', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ও রাজর্ষি বাদে) চোখে পড়ে তাহা মনে হয় পাশ্চাত্য জীবন দৃষ্টি সুলভ — রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা 'তিনসঙ্গীতেও (১৯৪০) ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। তবুও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী মালমসলা লইয়া কিছু রচনা করেন নাই। —"বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখি নি। বাইরে থেকে মালমসলা ধার, নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" [৩২]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময়কর। সেই প্রতিভা কোন কিছুর প্রভাব দ্বারা পুষ্ট হইতে পারে না। তিনি স্বীয় মহিমায় স্বতন্ত্র। স্বীয় ব্যক্তিত্বে ভাস্বর।

শরৎচন্দ্র বর্মা বাস কালে চার্লস ডিকেন্সের ভক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি বাঙালী জীবনের নিপুণ কথা-সাহিত্যিক — মনে প্রাণে চিন্তায় ভাবনায় খাঁটি বাঙালী লেখক। রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রের উপর কোনো পাশ্চাত্য - সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তায় নাই একথা সত্য। কারণ শরৎসাহিত্যের ধারার মূল - প্রবাহটি স্বদেশেই জাত আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য - সাধনার ধারাটি দেশের মাটিকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্বকে পাদ-পীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্বজনীন আর শরৎ সাহিত্য একান্তভাবেই বাঙালীর হৃদয়ানুভূতির আলেখ্য।

ভারতী গোষ্ঠীর লেখকেরা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃতি। ফরাসী, ডাচ্, নরোজীয়ান, জার্মান, ইত্যাদি সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হইতে লাগিল — ভারতীপর্বে এই উদ্যোগের সুযোগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিদেশী কাহিনী ও চরিত্রের অনুসরণে বাঙালী পরিবেশে উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন — ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-ধারার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সংযোগ ঘটিতে লাগিল বিস্ময়কর দ্রুততায় — ইহার ভালো মন্দ দুই ফলই ফলিল। কল্লোল পর্বের তরুণ লেখকের নিকট কন্টিনেন্টাল ও ইংরেজী সাহিত্য প্রেরণাদাত্রী শক্তিরূপে কার্যকরী হইয়াছে — ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচ্য ঔপন্যাসিকবৃন্দের রচনায় বিদেশী সাহিত্যের অভিঘাত তীব্রতর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এই তরুণ লেখকবৃন্দ ত্রিশংকু অবস্থায় যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই তরুণ সাহিত্যসেবী আকাঙ্ক্ষিত পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই — তাই তাঁহারা ধাবমান হইলেন- পশ্চিমে, শুধু ইংরেজী সাহিত্য নয় — কনটিনেনটাল সাহিত্যের উদ্যানে — রুশীয়, স্ক্যান্ডিনেভিয়, ফরাসী ইত্যাদি। যাহা চাহিতেছিলেন তাহা সেই বস্তু — উদগ্র যৌনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ- মুক্ত জীবনদর্শন। এই মালমসলা লইয়া বড় বড় কারবারী সাজিয়া নবযুগের নবপর্যায়ের সাহিত্যের পসরা সৃষ্টি করিয়া কেবলমাত্র প্রোপাগান্ডা ও রবীন্দ্র বিরোধিতার জোরেই বাংলাদেশের নরম মাটিতে ঘাঁটি গাড়িয়া গোষ্ঠী লালন করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন —"যুদ্ধ শেষে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) য়ুরোপীয় সাহিত্য অনূদিত হইতে আরম্ভ করে এবং সেই সব গ্রন্থরাজিও ভারতের বাজারে আমদানি হইতে থাকে।"[৩৩] এই য়ুরোপীয় সাহিত্যের গভীরতম প্রভাব বর্তাইয়াছে — ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪ – ১৯৬১), দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭ – ১৯৮০) শ্রী অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪ - জীবিত), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় [অংশত] (১৯০০ – ১৯৭৫) শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৫ – জীবিত) শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭ – জীবিত), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩ – ১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮ – ১৯৭৪), এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮ – ১৯৫৬) ফ্রয়েডী তত্ত্বের যৌনচেতনা মুক্ত নরনারীর সম্পর্কের বিজ্ঞান-নিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যায়। লেখক-কেন্দ্রিক পৃথক পৃথক অংশে বিশদভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব ও যৌনচেতনা পুষ্ট সাহিত্য-কৃতির পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সে সময়ের বুদ্ধিজীবী তরুণ সাহিত্যিক পাশ্চাত্য ও কনটিনেনটাল সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন — আর 'কনটিনেনটাল' সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত রুশ ও স্ক্যান্ডেনেভিয় সাহিত্যের আকর্ষণ দুর্বার ছিল কারণ উদগ্র যৌন-চেতনা ওই সব সাহিত্যে বর্তমান। আর উগ্র বাস্তববাদ। এই সব সাহিত্য স্রষ্টার সৃজন ক্ষমতার উপর গভীর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করিল — উপকরণ, বিষয়-বিন্যাস ও নির্বাচন, রচনা - শৈলী, আঙ্গিক ও প্রযুক্তি এমন কি স্রষ্টার অত্যান্ত জীবনবোধের উপর সুদূর - সঞ্চারী প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল — স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও এই প্রভাব ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। — মোটকথা —"আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবন-জীজ্ঞাসার যে বহু বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে একালের তরুণ বাঙালী লেখকেরা যে পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে সেই বহু বিচিত্র জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন, একালের অন্যতম বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক "কল্লোল কালিকলম - গোষ্ঠীর' অন্যতম পুরোধা প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি থেকে তা' অনুমান করা যায় : —' জীবনকে দেখবার

পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন , গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি, তাতে দোষ কি ....
এতদিন ত' সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বড় বেশী সম্পর্ক ছিল না । জীবনকে দেখবার দৃষ্টিই ছিল যে দুর্লভ ।" [৩৪] রবীন্দ্র-শরৎ সমকালীন তরুণ লেখকের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর ছিল ইহা অনুমান করা যায় ।

রুশ সাহিত্যে গণজীবনের যে আলেখ্য আছে তাহা সেদেশেরই মাটির গন্ধে সুরভিত সেদেশেরই গণজীবনের মর্মকথা । আমাদের দেশের সে সময়ের তরুণ-লেখকেরা ত্রিশংকু অবস্থা প্রাপ্ত । পায়ের তলায় মাটি সরিয়া গিয়াছে । সমাজ ও জাতীয় চৈতন্য লুপ্ত হইয়াগিয়াছে কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি — তাই প্রগাঢ় সমাজবোধ ও দেশের জনজীবনের সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীরতর অভিজ্ঞতা ও মমত্ববোধের অভাবে এ যুগের (বিশ-ত্রিরিশ) দশকের তরুণ লেখকেরা রুশ সাহিত্যের বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যকার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই । এই কারণেই সম্ভবত গণজীবনের ছবি তথা বাঙালী কৃষকজীবনের কথা শ্রমিক বা মেহনতি মানুষের আর্থিক দুর্গতি ও অন্যান্য সমস্যা প্রাধান্য পায় নাই । তাহার বদলে পানওয়ালী, কয়লাখনির খনক বেকার ভবঘুরে বোহিমিয়ান জীবনের কাহিনী, পতিতা নারী ও কেরানী যুবকের প্রেম-দ্বন্দ্ব, দেহপিপাসা আর বস্তিবাসী হতভাগ্য ভিক্ষুকের কদর্য দেহ-চেতনার আলেখ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । শরৎচন্দ্রও পতিতানারীর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনায় ইহাদের চিত্রিত পতিতা-নারীর পার্থক্য জীবনবোধে ও কল্যাণ ধর্ম দৃষ্টিতে ।

ফরাসী সাহিত্য ও বাঙালী লেখকের মধ্যে মনে হয় একটি আন্তরিক যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল । প্রমথ চৌধুরীর ফুলদানী ১২৯৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পত্রিকায় বাহির হয় — ইহা প্রস্পার মেরিমীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত । এই লেখকেরই 'কার্মেন' গল্পের অসম্পূর্ণ অনুবাদ চৌধুরী মহাশয় করিয়াছিলেন । 'সাহিত্য' ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' ও সবুজপত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও আরো অনেকের ফরাসী সাহিত্য হইতে বাংলায় অনুবাদ বাহির হইতে থাকে যেমন ভিক্তর হুগোর 'বন্দী', দোদের 'মাতৃঋণ , 'নবাব', মোপাসাঁ-র 'জেকো' প্রভৃতি উপন্যাস ও প্রচুর ছোট গল্প প্রকাশিত 'ভারতী' পর্বে । আর এই পথের নিশানায় কল্লোল - সমসাময়িক লেখক কুলের সংযোগ ঘটিল ফরাসী লেখকবৃন্দের সঙ্গে ।

ফরাসী সাহিত্য ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ছিল রোমান্টিক । মূলত এই কালটি ছিল রোমান্টিক ভাবুকতার যুগ — ইহার প্রতিক্রিয়া রূপে ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

"রিয়ালিজম্" জন্মলাভ করিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্তাঁধালের "দী রেড্ অ্যান্ড দী ব্ল্যাক্" প্রকাশিত হয় — ফরাসী সাহিত্যে Realism - এর সূচনা। বালজাকের উপন্যাসে সেই Realism -এর প্রয়োগ ও প্রসার। গুস্তাভ ফ্লবের -এর "মাদাম বোভারী" (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মনে হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই এমিলজোলা ও তাঁহার অনুসারীদের রচনায় 'ন্যাচারালিজম্' — প্রকৃতবাদের সাহিত্য প্রসারের ফলেই ফরাসী সাহিত্যে সত্যকার বাস্তবাদ দেখা দিল। ' Realism ও ' Naturalism ' মধ্যে পার্থক্য আছে সুস্পষ্ট। সে বিচারের প্রয়োজন নাই — রিয়ালিষ্ট দ্রষ্টা ও শিল্পী আর 'ন্যাচারালিষ্ট' দ্রষ্টা — শিল্পী নন। রবীন্দ্র-শরৎ সমকালীন তরুণ লেখককুলের মধ্যে প্রেমেন্দ্র কুমার মিত্র প্রথম জীবনে প্রাকৃতবাদী অভিজ্ঞতা ও বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদী বুদ্ধিসাধ্য জীবন-বীক্ষার সহিত রোমান্টিকতা ও দুর্লভ গোচর জীবনের আলেখ্য রচনা করিয়াছেন শৈলজানন্দও ফরাসী সাহিত্যের 'রিয়ালিজিম্' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় তবে তাঁহার রচনার মূল স্বদেশের মাটিতেই। 'ন্যাচারিলিষ্টের' দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিরমত। তাঁহারা জীবনকে সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতে নারাজ। রবীন্দ্র-শরৎ সমকালীন লেখকবৃন্দের Naturalist জীবনদর্শনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের উপর ফ্লবের ও এমিলজোলার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য ছিল। জোলার যৌন-চেতনামূলক বিশ খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস ' Rougon Macqvart ' তাঁহাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রতি আকর্ষণ আর যে কারণেই হউক না কেন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাহা জীবনের শোভন সংযম-শাসিত কল্যাণময় রূপের জন্য নয় — একধরনের বন্ধন-অসহিষ্ণু বেপরোয়া মনোভাবেরই দ্যোতনা করে। এই সব আমাদের দেশের সে সময়ের তরুণ লেখকেরা ফ্রয়েডীয় যৌনচিন্তায় দীক্ষিত। ফরাসী সাহিত্যের আর একটি দিক সেকালের তরুণ লেখকেরা অনুসরণ করেন নাই — তাহা হইতেছে প্রকাশ রীতি ও আঙ্গিকের মধ্যে স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠ সংযত ক্ল্যাসিক্যালভঙ্গী। তরুণ লেখকেরা কথনবিলাসী রোমান্টিক ভাবুকতাসমৃদ্ধ মনোভাব লইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন — অন্নদাশংকর হইতে শুরু করিয়া উপরি-উক্ত প্রায় সব লেখকেরাই অতিকথনের দোষদুষ্ট। ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রলাঁ, স্ক্যান্ডিনেভীয় ঔপন্যাসিক বোয়ার ও নুট হামসুন (১৮৫৯ – ১৯৫২) -এর প্রত্যক্ষ প্রভাব এই পর্বের অনেকের উপর বর্তাইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম মৌলিক গল্প 'বেদে' হামসুনের ' Pan' -এর ছায়া ও প্রভাব সমৃদ্ধ।

হামসুনের Hunger অনুবাদ করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তার বাংলায় অনুবাদ করেন অচিন্ত্যকুমার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । জোহান বোয়ার নরওয়ে বাসী জন্ম ১৮৭২ মৃত্যু ১৯৫৯ তিনি মানবতার পূজারী ও দার্শনিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি । হামসুন বোয়ার উভয়েই ইহাদের উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । বোয়ারে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস The Great Hunger ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয় । এই গ্রন্থখানি মনে হয় সেকালের তরুণ লেখকদের মনে মনুষ্যত্বের উপর দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিয়াছিল — হতাশা - সংশয়ের মধ্যেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণা যেন তাঁহাদের Sustaining power রূপে কাজ করিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না — তার কারণ তাঁহারা কেহই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের আধ্যাত্মিক বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না । অতএব জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয় ঐ উৎস (আধ্যাত্মিক) হইতে আসে নাই — ফলে বিদেশ-এ হাত বাড়াইতে হইয়াছে । ' Prisoner who song ' গ্রন্থখানি প্রবোধ কুমার সান্যাল অনুবাদ করিয়াছিলেন — 'বন্দী বিহঙ্গ' । — ব্যক্তি দৃষ্টি দিয়া জীবনের অর্থ অন্বেষণ করিয়াছেন বোয়ার ও হামসুন — সেখানে সমাজ ও নীতির স্থান কোথায় সার্থকতাই বা কী ? অনেকটা যেন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অতিরেক । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুনির্ভর । বন্ধন-অসহিষ্ণু নিয়ম না মানা বোহিমিয়ান জীবন চর্যা । এই কারণেই হয়ত ইহার আকর্ষণ এত প্রবল ছিল ।

বাঙালীর কাছে 'কনটিনেনটাল' সাহিত্য অপেক্ষা ইংরাজী ও সাহিত্যের আবেদন ও প্রভাব অনেক বেশী । আর কনটিনেনটাল সাহিত্যের যা কিছু সম্পদ সবই আসিয়াছে ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পৃথিবীর পক্ষে একটি গুরুতর ঘটনা । যুদ্ধের পরে ইংরাজ সাহিত্যিকদের চিন্তাধারায় আধুনিক কালের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল — যেমন টি. এস. এলিয়ট-এর The Waste Land (1922) অথবা ' The Hollowmen '(1934). কবিতায় । ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স ও অলডাস হাক্সলি বাঙালী ঔপন্যাসিকের প্রিয় হইয়া উঠিল । সংশয়ী অবক্ষয়িত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণের কথা নানা বিষয় সমৃদ্ধ Sex - কেন্দ্রিক তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন লরেন্স । তিনি লিখিয়াছেন —— My great religion is a belief in the blood, the flesh, as being than the intellect ." — লরেন্সের এই তত্ত্বটি ঘুরিয়া ফিরিয়া কবিতা গল্প ও উপন্যাসের ভাব-গ্রন্থি রচনা করিয়াছে — যেমন . Sons and Lovers', (1913) Rainbow(1915), Lady Chatterlys' Lover (1928), Fantasia of the Un conscious, (1922)

আর উপরি-উক্ত লেখকবৃন্দ ও সাহিত্য সেকালের হতাশাদীর্ণ সংশয়বাদী লেখকবৃন্দের নিকট এক অনাস্বাদিতপূর্ব জীবনের আদর্শ বহন করিয়া আনিয়াছিল রোমান্টিক লেখককুলের কাছে। এই নূতন জীবনদর্শনের বিশেষ মূল্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এই যুগের অপর একজন ইংরাজ ঔপন্যাসিকের অভ্রান্ত প্রভাব বাঙালী লেখকবৃন্দের (উল্লিখিত লেখকবৃন্দ) উপর ক্রিয়াশীল ছিল তিনি অলডাস হাকসলি।" এই বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী লেখক বর্তমান পৃথিবীর, বিশেষভাবে যুদ্ধোত্তর জীবনের কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য, বুদ্ধিজীবীর জীবনের অস্থিরতা অনিশ্চয়তা ও স্ববিরোধিতার বিশ্লেষণ তাঁর গল্পে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।"[৩৫] লক্ষ্যহীন জীবনচর্যা অন্তঃসারশূন্যতা নিম্নউল্লিখিত উপন্যাসে ব্যঙ্গের কশাঘাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে — যেমন' Crome Yellow (১৯২১) Antic Hay (১৯২৩), Those Barren Leaves (১৯২৫), Brave New World (১৯৩২), Point Counter Point (১৯২৮) — এই সব উপন্যাসের পটভূমি নগর জীবন। সমস্যা প্রধান উপন্যাস। কাহিনী অপ্রধান। বক্তব্য বা আইডিয়া প্রধান। আর এই বক্তব্য সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, যৌন-আচরণ, সাহিত্য-শিল্পকলা, প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে। হাকসলির উপন্যাসের আকর্ষণ মনন সমৃদ্ধিতে। হাকসলির প্রভাব আলোচ্য লেখক গোষ্ঠীর উপর বর্তমান। বিশেষ করিয়া বুদ্ধদেব বসু ও অন্নদাশংকর রায় সম্বন্ধে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস গল্পের পটভূমি নগর। কলিকাতার নাগরিক পরিবেশের মধ্যে সমাজের উচ্চবর্গের নর-নারীর কৃত্রিম আপাত উজ্জ্বল অথচ অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য জীবনের যে লঘু ব্যঙ্গরসাশ্রিত মনোরম চিত্র আছে তাহার সঙ্গে হাকসলির উপন্যাস গল্পের সাদৃশ্য বর্তমান মনে হয়। অন্নদাশংকর হাকসলির মননদীপ্ত ও ব্যঙ্গাশ্রিত রচনাশৈলীর অনুবর্তন করিয়াছেন বলা যায়। মনন চেতনা ও রোমান্টিক ভাবুকতার মিশ্রণজাত উপন্যাস সাহিত্য ও গল্প ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের প্রবর্তনা করিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরসাশ্রিত 'আইডিয়া' প্রধান উপন্যাস রচনার ধারার স্রষ্টা। তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্বের রচনা ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার উপন্যাসে ঘটনার বাহুল্য কমিয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে। মনে হয় হাকসলি অংশত যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ কোনো বিদেশী প্রভাব কবলিত না হইয়াই স্বীয় প্রতিভাবলে নব পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন 'চোখের বালি' হইতেই সূচনা। বুদ্ধদেব প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ হাকসলির তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ-ধর্ম বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্ক ও

বিশ্লেষণ প্রবণতাকে সরাসরি অনুসরণ করিতে আগ্রহী ছিলেন না কারণ হয়ত রোমান্টিক - চেতনার প্রাবল্য তাঁহাদের রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল । তবে কিছুটা মনন আর রোমান্টিক ভাবুকতা এই উভয় উপাদানই রবীন্দ্রনাথ হইতে তাঁহাদের রচনায় সঞ্চারিত হইয়াছিল । অনেক সময় হয়ত তাহারা একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই । তথাপি ইহা সত্য । রবীন্দ্র অনুসারিতা ও হাক্সলির প্রেরণা ছাড়াও ইংরাজী কথা সাহিত্যের জেমস্‌ জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্‌ ও ডরোথি রিচার্ডসনের ব্যবহৃত চেতনা-প্রবাহ-এর (Stream of Consciousness) প্রভাব ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (অন্তঃশীলা) অন্নদাশংকর রায় (রত্ন ও শ্রীমতী), বুদ্ধদেব বসুর (আমনার মধ্যে একা) উপন্যাসে বর্তমান । যে সব বাঙালী লেখক সম্বন্ধে পর্যালোচনা হইতেছে তাঁহারা প্রত্যেকেই বস্তুত একই মনোভাব সম্পন্ন নহেন । প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তাই বিদেশী সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ — কখনও মননাশ্রিত জীবন জিজ্ঞাসা মানবতাবাদ, যৌনচেতনা আবার কখনও রোমান্টিক ভাবুকতা, কখন - অসহিষ্ণু জীবন তৃষ্ণা, আবার কখনও সমাজ-বিমুক্ত নর-নারীর যৌনাবেগ ও অবদমিত কামনা-বাসনা ক্ষুব্ধ জীবনদর্শন তাহাদের প্রেরণাও সৃষ্টি কার্যের সহায়ক হইয়াছিল । আর হয়ত অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যতখানি মেজাজের দিক দিয়া হামসুনের দ্বারা আকৃষ্ট বুদ্ধদেব বসু ততখানি নহেন । উভয়ের মানসিকতায় পার্থক্য বর্তমান । তবে মূলত তাঁহারা এক এই অর্থে যে প্রত্যেকেই সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টির প্রয়াসী — আর প্রয়াসের অনেকটাই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিবার জন্যই । সেই অতিক্রম কি তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন ? মনে হয় না — রবীন্দ্রনাথ যে উত্তমর্ণ — শত প্রয়াসেও তাহা সম্ভব হইবার নয় । অচিন্ত্য — বুদ্ধদেব ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক পৃথক আলোচনার অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে । নর-নারীর মৈথুন প্রবৃত্তির প্রতি ইঁহাদের তীব্র আকর্ষণ — রোমান্টিক রহস্য প্রবণতাই এই দিকে তাহাদের চালিত করিয়াছে — অন্নদাশংকরের রত্ন ও শ্রীমতীতে, বুদ্ধদেব বসুর 'আমনার মধ্যে একা' ও অচিন্ত্য কুমারের 'প্রথম কদম ফুল' -এ যৌন চেতনার কাব্যময় রোমান্টিক আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নর-নারীর গূঢ় সম্পর্কের আলেখ্য আছে তাহা স্থূল নয় কোথাও উগ্র হইয়া রসহানি সৃষ্টি করে নাই — অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাহা জীবনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া এক অখণ্ড জীবন সত্যের রস-মূর্তি লাভ করিয়াছে । বস্তুর ভারে উপন্যাসের 'ভাব-দেহ' থর থর করিয়া কম্পিত হয় নাই — সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বিনষ্ট হয় নাই — এমন কি মোহিনী চরিত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নাই ।

ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ — অবচেতন - চেতন ও উচ্চেতন এই তিনলোকেরই বার্তাবহন করিয়া সাহিত্য — সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা ইঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল । বুদ্ধদেব বসুর তো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অন্তরে চাপা অভিমান ছিল — তাঁহারা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অতিক্রম করিতে অক্ষম । অক্ষমতার কারণও শক্তির অভাব নয় — কালবৈগুণ্য । "আর এই চাপা অভিমানের কারণ নিজেদের শক্তির উপর অগাধ আস্থা এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা — বিচিত্রতা-উত্তুঙ্গতার জন্য অস্বস্তি ।"৩৬ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসৃষ্টি রবীন্দ্র-ভাবিত । নরেন্দ্র ও মাইকেল আর্নেলের মতো ইংরেজী লেখকবৃন্দের প্রভাব বেশ আছে । বুদ্ধদেব রবীন্দ্র ভাষা শিল্পকে , প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন নির্দ্বিধায় । তাই বলিতে সংকোচ হয় না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উত্তমর্ণ তিনিই সাহিত্যের ~~কার~~ কারবারে অধমর্ণ ।

— ০ —

উল্লেখ - পঞ্জী

১। An Afflucut Society: Chester Bowels.

২। সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী — ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র — পৃঃ ৬৫ - ৬৬

৩। Novelist Recut & Contemporary(1951)-R.A.James
(Longmans Green Green And Company, London).

৪। Forty Years of English Literature(1951) - R.A.Scot James P-2

ঘরে বাইরে (১৯১৬) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুরঙ্গ — (১৯১৫) " "

শেষের কবিতা (১৯২৯) " "

৫। কালের প্রতিমা — পৃঃ ২১৭ — ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়

৬। চতুরঙ্গ পত্রিকা - 'ভারতীয় ঐতিহ্য' বর্ষ ৩১ সংখ্যা ২ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৯৬৯
— হুমায়ুন কবির।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন (পৃঃ ২৫৭ - ২৫৮)

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) " (পৃঃ ২৫৮)

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) " (পৃঃ ২৬৫)

১০। শেষের কবিতা (১৯২৯) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন (পৃঃ ২৬৫)

১২। প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ — শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কে লিখিত পত্র
সাহিত্যের স্বরূপ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ২৫

১৩। স্বদেশ ও সাহিত্য — পৃঃ ১৫৪ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) - পৃঃ ১৯২ ডঃ সুকুমার সেন

১৫। প্রবন্ধ -'সমাজের মূল্য' ভারতবর্ষ' পত্রিকা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ অনিলাদেবী
ছদ্মনামে প্রকাশিত।

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ১৯১ ডঃ সুকুমার সেন।

১৭। 'সাহিত্যের সত্য' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। ভাষণ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তারিখ জানা নেই)

১৯। শ্রী উপল ঘোষকে লেখা পত্র, জানুয়ারী ১৯৩২ (শরৎচন্দ্র কর্তৃক লিখিত পত্র)

২০। সাহিত্যের পূর্ণ বিচার — সাহিত্যের খবর অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ প্রকাশিত হয়

২১। রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর — পৃঃ ২ প্রমথ নাথ বিশী।

২২। রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর — পৃঃ ৩ প্রমথ নাথ বিশী ।

২৩। রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর পৃঃ ৩ প্রমথ নাথ বিশী ।

২৪। রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর পৃঃ ৯ অনুচ্ছেদ ১ প্রমথ নাথ বিশী

২৫। প্রবন্ধ — আধুনিকতম সাহিত্য (বিচিত্রা - চৈত্র - ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী)

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২৫৯ : ডঃ সুকুমার সেন ।

২৭। আবিষ্কার কবিতা (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) — অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ।

২৮। বাঁশরী — (১৯৩৩) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) — পৃঃ ২৬৬ ডঃ সুকুমার সেন ।

৩০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২৬৮ ডঃ সুকুমার সেন

৩১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ২৬৭ ডঃ সুকুমার সেন ।

৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ চিঠিপত্র ৯ম খন্ড ।

৩৩। রবীন্দ্রজীবনী — পৃঃ ৩৩৫ ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।

৩৪। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য — পৃঃ ২০৯ ডঃ গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী ।

৩৫। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য — পৃঃ ২২১ ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ।

৩৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) পৃঃ ৩৩৮ ডঃ সুকুমার সেন ।